যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন

কোনটি এবং কেন?

গবেষণা সিরিজ-১১

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1005-1

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০১
সপ্তম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	আইন যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডসমূহ	২৯
	আইন প্রণয়নকারীর বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	২৯
	আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	৩০
	বিচার ব্যবস্থার বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	৩০
৬	আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের প্রধান দিকসমূহের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত	৩১
৭	**মানদণ্ড-১.১ :** আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক (Subjective) বিস্তৃতি	৩১
৮	**মানদণ্ড-১.২ :** আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি	৪৩
৯	**মানদণ্ড-১.৩ :** আইন প্রণয়নকারীর সংখ্যা	৪৪
১০	**মানদণ্ড-১.৪ :** আইন প্রণয়নকারীর নিরপেক্ষতা	৪৬
১১	**মানদণ্ড-১.৫ :** আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শক্তি	৪৮
১২	**মানদণ্ড-১.৬ :** আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্ব	৫০
১৩	**মানদণ্ড-১.৭ :** আইন প্রণয়নকারীর কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি	৫১
১৪	**মানদণ্ড-১.৮ :** মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার	৫৫

১৫	**মানদণ্ড-১.৯ :** আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় প্রণীত আইনে না থাকা	৫৬
১৬	**মানদণ্ড-২.১ :** আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক	৫৭
১৭	**মানদণ্ড-২.২ :** আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা	৬০
১৮	**মানদণ্ড-৩.১ :** বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া	৬১
১৯	**মানদণ্ড-৩.২ :** বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া	৬৩
২০	**মানদণ্ড-৩.৩ :** আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া	৬৪
২১	**মানদণ্ড-৩.৪ :** আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা	৭০
২২	**মানদণ্ড-৩.৫ :** বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা	৭৮
২৩	**মানদণ্ড-৩.৬ :** ওকালতি ও সাক্ষী ব্যবস্থার ধরন	৮১
২৪	**মানদণ্ড-৩.৭ :** দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন	৮৩
২৫	**মানদণ্ড-৩.৮ :** শাস্তি থেকে কারও রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা	৮৭
২৬	**মানদণ্ড-৩.৯ :** পুরস্কারের ধরন	৮৮
২৭	শেষ কথা	৮৯

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

আইন হলো মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার বিধি-বিধান। বর্তমান বিশ্ব মানবতার সামনে দুই ধরনের আইন আছে– মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইন। আর ২/১টি বাদে পৃথিবীর সকল দেশে মানব রচিত আইন চালু আছে। ঐ ২/১টি দেশেও কুরআনের আইন আংশিকভাবে চালু আছে। কোনো দেশে একটি আইন চালু হতে বা থাকতে পারে শুধু তখনই, যখন অধিকাংশ মানুষ ঐ আইন চালু করা বা চালু রাখার পক্ষে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা রাখে বা পালন করে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছে যে, মানব রচিত আইন তাদের জীবনকে শান্তিময় করতে সক্ষম।

পুস্তিকাটিতে Common sense-এর ২০টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনকে যাচাই করা হয়েছে। এ যাচাইয়ের ফলাফল দেখলে যেকোনো Common sense সম্মত মানুষ অতি সহজে জানতে ও বুঝতে পারবে যে– যৌক্তিকতা ও কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব রচিত আইন কুরআনের আইনের ধারে-কাছেও যেতে পারে না। তাই পৃথিবীর সকল নিষ্ঠাবান মুসলিম, যারা চান তাদের দেশ বা সমস্ত পৃথিবীতে কুরআনের আইন চালু হোক এবং সারা পৃথিবীর মানুষ সার্বিক শান্তিতে জীবনযাপন করুক, তাদের দায়িত্ব হবে ঐ তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, Common sense-বিবেকধারী যারাই ঐ তথ্যগুলো জানতে পারবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই কুরআনের আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানতে বাধ্য হবে। আর এদের মধ্যে যারা সমাজের সার্বিক শান্তি কামনা করে তাদের অনেকেই কুরআনের আইন সমাজে চালু করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

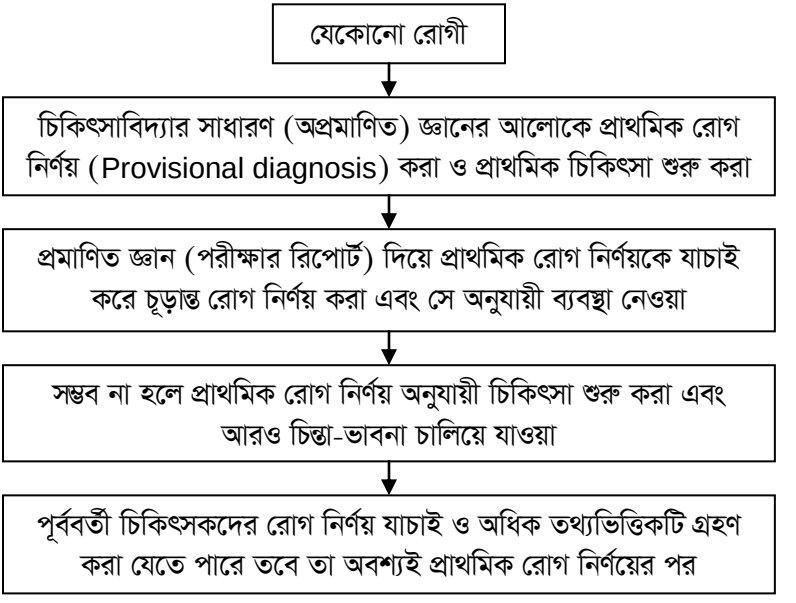

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

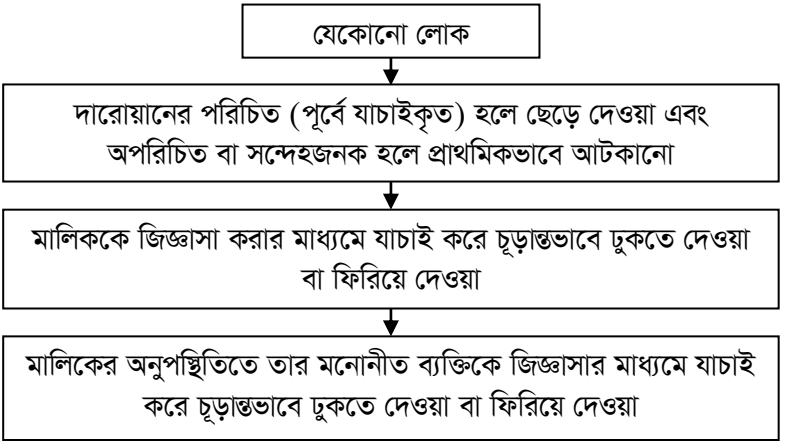

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

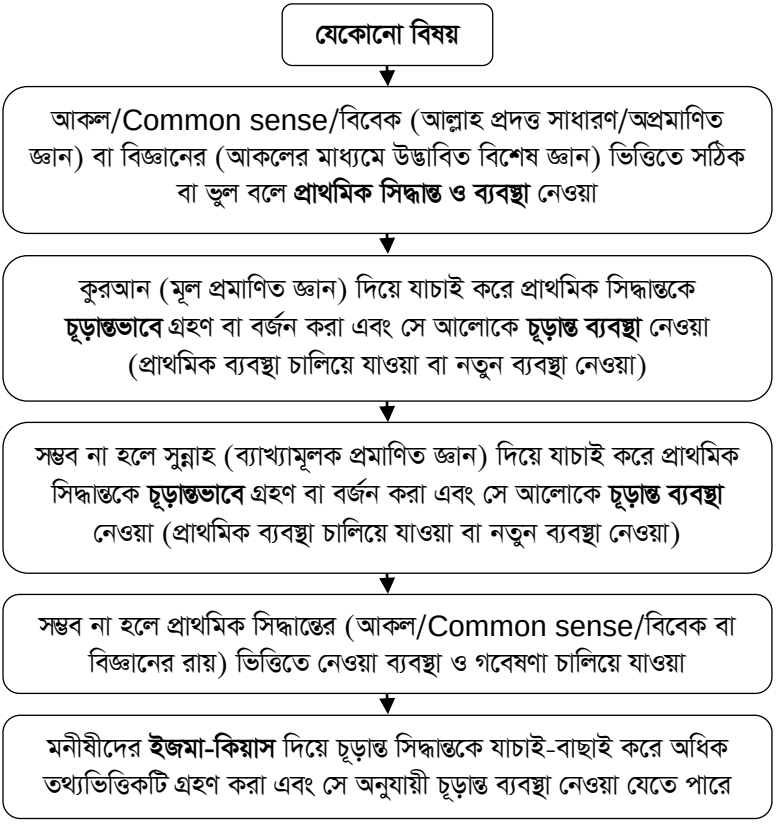

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

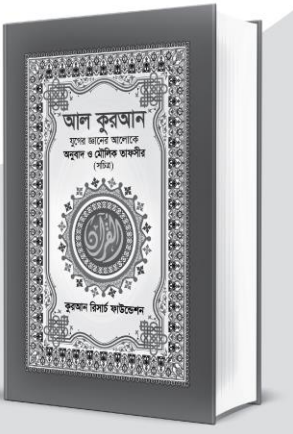

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

আইন হলো মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার বিধি-বিধান। বর্তমান বিশ্ব মানবতার সামনে দুই ধরনের আইন রয়েছে– মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইন। আর ২/১টি বাদে পৃথিবীর সকল দেশে মানব রচিত আইনই চালু আছে। আর ঐ ২/১টি দেশেও কুরআনের আইন চালু আছে আংশিকভাবে। কোনো দেশে একটি আইন চালু হতে বা থাকতে পারে শুধু তখনই, যখন অধিকাংশ মানুষ ঐ আইনের পক্ষে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছে যে, মানব রচিত আইন তাদের জীবনকে শান্তিময় করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানব রচিত আইন কি মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা যদি মানুষকে নানা ধরনের প্রশ্ন করি এবং তার উত্তর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাই তবে তা সম্ভব হবে না। কারণ, শান্তি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয়। একজনের কাছে যেটি শান্তি মনে হবে অন্যজনের কাছে তা অশান্তি মনে হতে পারে। তাছাড়া প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে আছে কি না তা পর্যালোচনা করতে হলে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন অসংখ্যভাবে তৈরি করতে হবে। তারপর প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে সেই অসংখ্য প্রশ্নের মন থেকে দেওয়া উত্তর সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করতে হবে। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই একটি আইন মেনে মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে থাকবে কি না বা শান্তি পাবে কি না, তা পর্যালোচনা করার সর্বোত্তম উপায় হলো– ঐ আইনকে কিছু মানদণ্ডের (Standard) ভিত্তিতে যাচাই করা। মানদণ্ডগুলো এমন হতে হবে যেন সকল মানুষের Common sense নির্দ্বিধায় বলে দেয়– একটি আইন মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে হলে অবশ্যই আইনটিকে ঐ সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো, Common sense-এর কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনকে যাচাই করা। সে যাচাইয়ে যদি দেখা যায় যে, কুরআনের আইন সকল মানদণ্ডে সম্পূর্ণ

উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা মোটেই পারে না, তবে জোর দিয়েই বলা যাবে– Common sense অনুযায়ী কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর এবং মানব রচিত আইন তা নয়। আর তখন পৃথিবীর সকল নিষ্ঠাবান মুসলিম, যারা চান তাদের দেশ বা সমস্ত পৃথিবীতে কুরআনের আইন চালু হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ সার্বিক শান্তিতে জীবনযাপন করুক, তাদের দায়িত্ব হবে ঐ তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, Common sense-ধারী যারাই ঐ তথ্যগুলো জানতে পারবে, তাদের মধ্যে সবাই না হলেও অধিকাংশই কুরআনের আইনের যৌক্তিকতা মানতে বাধ্য হবে। আর এদের মধ্যে যারা সমাজের সার্বিক শান্তির কথা চিন্তা করে বা কামনা করে তাদের অনেকেই কুরআনের আইন সমাজে চালু করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস।

আইন যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডসমূহ

একটি আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর হবে কি না তা যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডগুলো মূলগতভাবে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. আইন প্রণয়নকারী (ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা) সম্পর্কিত বিষয়।
২. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কিত বিষয়।
৩. বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়।

উল্লিখিত তিন শ্রেণির বিষয়ের বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম–

১. আইন প্রণয়নকারীর প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

আইন মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার ব্যাপারে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা যথাযথ হওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আইনেই যদি দুর্বলতা থাকে তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা যতই মানসম্মত হোক না কেন মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে না। তাই আইনকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই দুর্বলতা মুক্ত হতে হবে। আর এ জন্য আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থাকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উন্নীত হতে হবে তার প্রধান দিকগুলো হলো–

১.১ আইন প্রণেতার জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতি।
১.২ আইন প্রণেতার জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি।
১.৩ আইন প্রণেতার সংখ্যা।
১.৪ আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতা।
১.৫ আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী সংস্থার শক্তি।
১.৬ আইন প্রণেতার স্থায়িত্ব।
১.৭ আইন প্রণেতা কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি।
১.৮ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার।
১.৯ আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো কিছুর অনুমতি প্রণীত আইনে না থাকা।

২. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

আইন দিয়ে মানুষকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে হলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকেও যথাযথ মান ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। এ স্তরের দুর্বলতা কাটাতে হলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উন্নীত হতে হবে তার প্রধানগুলো হলো–

২.১ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক।

২.২ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা।

৩. বিচার ব্যবস্থার প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

যথাযথ শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ আইন মানতে উৎসাহিত এবং অমান্য করতে নিরুৎসাহিত হয় না। তাই প্রণীত আইনের যথাযথ সুফল পাওয়ার পথে বিচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সে বিচার ব্যবস্থা হতে হবে নিখুঁত। বিচার ব্যবস্থা নিখুঁত হতে হলে তাকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উত্তীর্ণ হতে হবে তার প্রধান দিকগুলো হলো–

৩.১ বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া।

৩.২ বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া।

৩.৩ আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া।

৩.৪ আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা।

৩.৫ বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা।

৩.৬ ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার ধরন।

৩.৭ দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন।

৩.৮ শাস্তি থেকে কারও রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা।

৩.৯ পুরস্কারের ধরন।

আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের প্রধান দিকসমূহের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

আমরা এখন আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের উল্লিখিত বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো– কুরআনের আইন, না মানব রচিত আইন যৌক্তিক ও কল্যাণকর। বিশেষ দিকসমূহকে আমরা মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করবো।

মানদণ্ড-১.১

আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক (Subjective) বিস্তৃতি

যে ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করবে তাকে নিম্নের দুটি বিষয়ের পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকতে হবে–

ক. মানুষ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান

এ জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হবে– মানুষের ভ্রূণবিদ্যা (Embryology), অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), শরীরবৃত্ত (Physiology), মনোবিদ্যা (PSzchology), বুদ্ধিবৃত্তি (Intellectuality), যৌনবিদ্যা (Sexology), আচার-আচরণ (Behavior), প্রয়োজন (Need), বয়োবৃদ্ধতা (Aging process), খাদ্য-খাবার (Food), রোগ (Disease), চিকিৎসা (Treatment), সীমাবধ্যতা (Limitations) ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান।

খ. মানুষের শরীরের বাইরের বিশ্ব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান

এ জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হবে– পৃথিবী ও মহাকাশের যা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কাজে লাগে বা মানুষকে প্রভাবিত করে তার সকল কিছুর প্রাকৃতিক জ্ঞান। অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কিত সকল প্রাকৃতিক জ্ঞান।

যে সত্তার উপরোক্ত বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান নেই, তিনি কখনই মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বাস্থ্য, দেশ পরিচালনা এবং মহাবিশ্বের সকল বস্তুর ব্যবহার করা বা না করা নিয়ে এমন কোনো আইন বানাতে পারবেন না, যা মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে।

আলোচ্য মানদণ্ডের নিরিখে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনের অবস্থান পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত–

মানব রচিত আইন

মানব সমাজের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার (পার্লামেন্ট, লোকসভা, সিনেট ইত্যাদি) উপরোক্ত সকল বিষয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকা অসম্ভব। আর পৃথিবীর কেউ তা দাবিও করে না। এ জন্যই–

১. বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের আবিষ্কৃত অসংখ্য তত্ত্ব (Theory) কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়।

২. সমাজ বা রাষ্ট্র শাসনে মানুষের তৈরি বিভিন্ন আইনকেও কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়। আর এটি পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলে একই দেশের মানুষ যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়, তেমনি বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়। এটি কোনো মতেই যুক্তিসংগত নয়। কারণ, একই কাজ করে একটি দেশের বিভিন্ন সময়ের মানুষ বা বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে পুরস্কার (শান্তি) বা শাস্তি (কষ্ট) প্রাপ্ত হবে, এটি যুক্তিসংগত নয়।

আর মানুষের জ্ঞান কত স্বল্প তা অসংখ্য উদাহরণের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায়। ঐ উদাহরণের একটি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির চরম শিখরে। সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও অধিকাংশ মানব রোগের প্রকৃত কারণ (Etiology) জানে না।

কুরআনের আইন

জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইনের প্রণেতার অবস্থান কোথায় তা তিনি অসংখ্যবার নানা ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। সে বক্তব্যের দুটি নিম্নরূপ–

তথ্য-১

..... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

... ... অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা কিছু আছে পৃথিবীতে। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

(সুরা আল হুজরাত/৪৯ : ১৬)

তথ্য-২

..... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

... ... আর আল্লাহ সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞানী।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতার সকল বিষয়ের জ্ঞান আছে বা তিনি সর্বঅভিজ্ঞ কথাটির অর্থ হচ্ছে– তিনি মানুষের শরীর এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান রাখেন। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য আয়াত আল কুরআনে আছে।

কুরআনের আইন প্রণেতার মানুষের শরীর ও শরীরের বাইরের পৃথিবীর নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ–

ক. মানব শরীরের নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ

এ বিষয়ের দুটি প্রমাণ হলো–

প্রমাণ-১

❖ **মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর :** মানব ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তর বিন্যাস সম্পর্কে যে তথ্য বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তে এসেছে তা হলো–

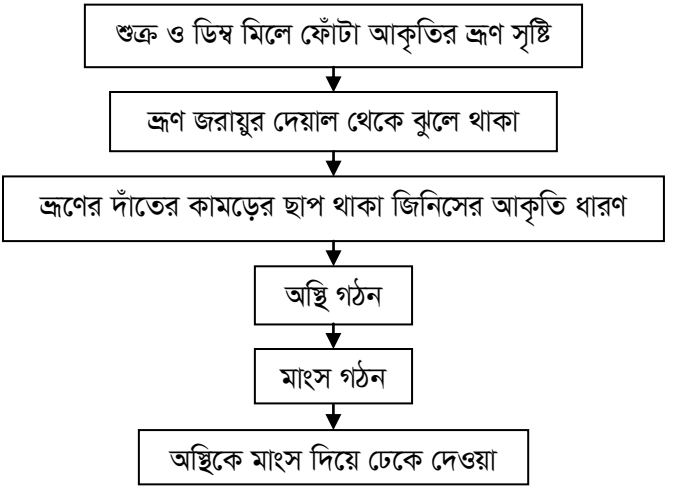

চিত্র-১ : শুক্র (Sperm) ও ডিম্ব (Ovum)

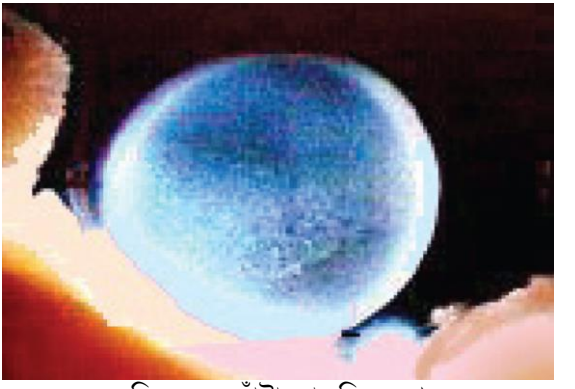

চিত্র-২ : ফোঁটা আকৃতির ভ্রূণ

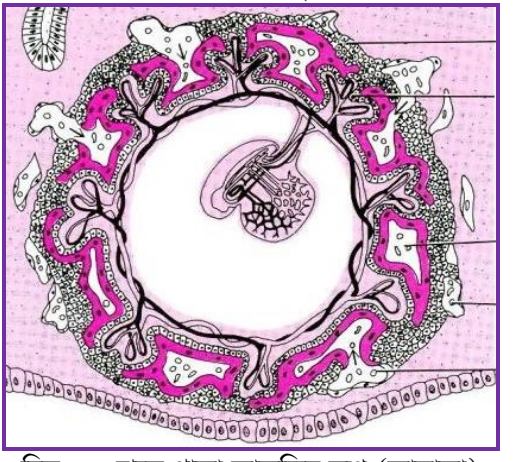

চিত্র-৩ : ঝুলে থাকা আকৃতির ভ্রূণ (আলাকা)

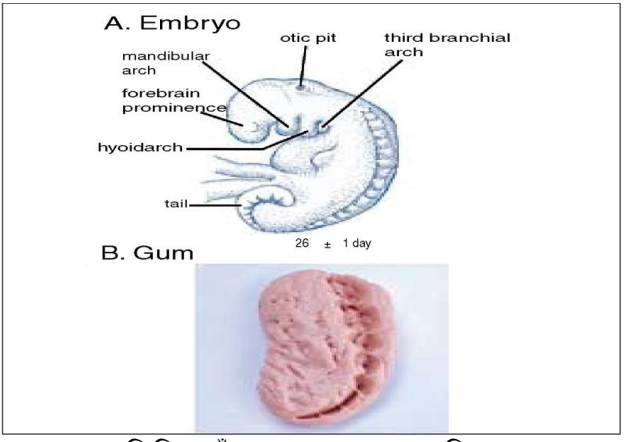

চিত্র-৪ : নরম জিনিসে দাঁতের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ (মুদগাহ)

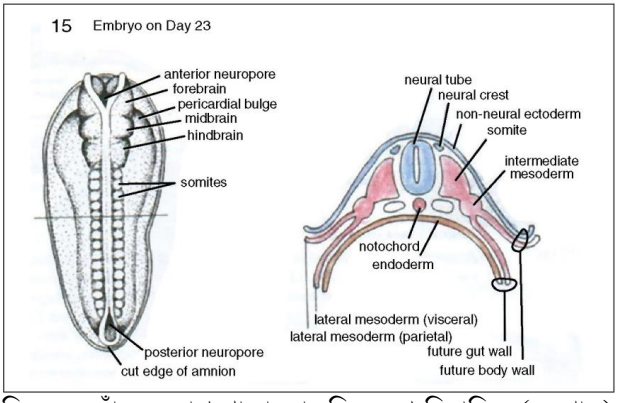

চিত্র-৫ : দাঁতের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ বিস্তারিত (মুদগাহ)

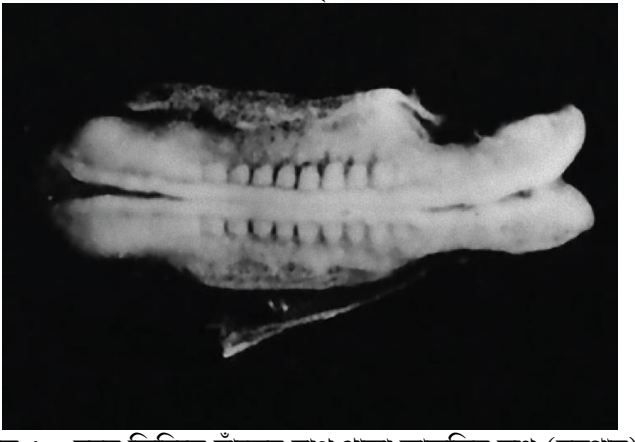

চিত্র-৬ : নরম জিনিসে দাঁতের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ (মুদগাহ)

চিকিৎসা বিজ্ঞান এ তথ্যগুলো জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। আর তা জানা গিয়েছে মাইক্রোসকোপ, আল্টাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এম.আর. আই ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর। ঐ যন্ত্রসমূহ আবিষ্কারের সন হলো– মাইক্রোসকোপ : ১৫৯০, আল্টাসোনোগ্রাফি : ১৯৭২, সিটি স্ক্যান : ১৯৭৭, এম.আর.আই : ১৯৭৭।

এ বিষয়ে প্রায় ১৫০০ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনের তথ্য–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ .....

আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মূল উপাদান থেকে। অতঃপর আমরা (অতা'ক্ষণিকভাবে) তা ফোটার আকৃতিরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু)। পরে আমরা (অতা'ক্ষণিকভাবে) ফোঁটাকে পরিণত করি **'আলাকা- তে,** অতঃপর (অতা'ক্ষণিকভাবে) আলাকাকে পরিণত করি **'মুদগা-তে,** অতঃপর (অতা'ক্ষণিকভাবে) মুদগা থেকে অস্থি তৈরি করি, তারপর **অস্থি**কে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি স্বতন্ত্র এক সৃষ্টিরূপে। অতএব বরকতময় আল্লাহ তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা।

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মায়ের পেটে ভ্রূণের স্তর বিন্যাস বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন যা আবিষ্কার করেছে কুরআন ১৫০০ বছর আগে অভিন্ন কথাই বলেছে।

প্রমাণ-২

❖ **মানুষের শরীরে Common sense/আকল, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, গর্ব, অহংকার, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থাকার স্থান :** জ্ঞানের শক্তি Common sense, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, গর্ব, অহংকার, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থাকে মানুষের মনে (Mind/অন্তর)। আরবীতে মনকে বলা হয় 'ক্বলব' (قَلْبٌ)। মানুষের শরীরে মনের অবস্থান সম্পর্কে বর্তমান সময়েও অধিকাংশ সাধারণ (চিকিৎসক নন) মানুষের ধারণা হলো– মন থাকে বক্ষের বাম পাশে থাকা হৃৎপিণ্ডে (Heart/হৃদয়)।

তাইতো যিক্‌রের মাধ্যমে 'ক্বলব' পরিষ্কার করার বিষয়টিকে বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট/ হৃৎপিণ্ড পরিষ্কার করা অর্থে ধরা ও চালু করা হয়েছে।

আর সাধারণ জ্ঞানে মনের ব্যাথাকে প্রকাশ করা হয় তীরবিদ্ধ হার্টের ছবির মাধ্যমে। ছবি দেখুন–

চিত্র-৭

বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– বুকের বাম দিকে থাকা হার্টের (Heart) একমাত্র কাজ হলো রক্ত পাম্প করা। ছবি দেখুন–

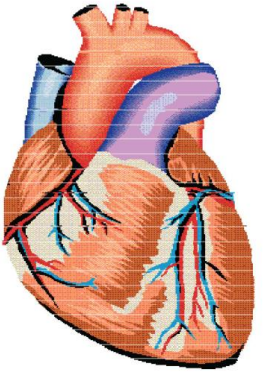

চিত্র-৮

অন্যদিকে বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী, মানব শরীরে মনের (Mind/অন্তর) অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইন। ছবি দেখুন–

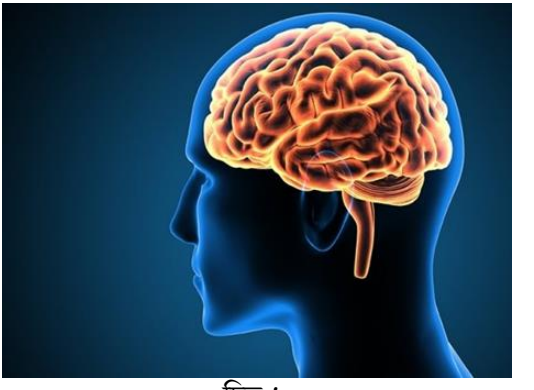

চিত্র-৯

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মানব ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
২. মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
৩. পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

এবং ব্রেইন ডান ও বাম দুটি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে। ছবি দেখুন–

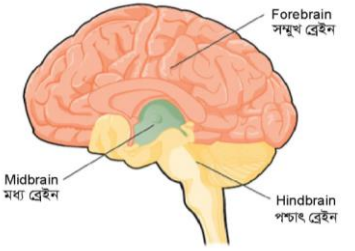

চিত্র-১০

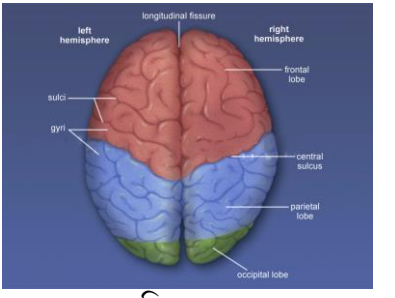

চিত্র-১১

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত–

১. Frontal lobe
২. Parietal lobe
৩. Temporal lobe
৪. Occipital lobe

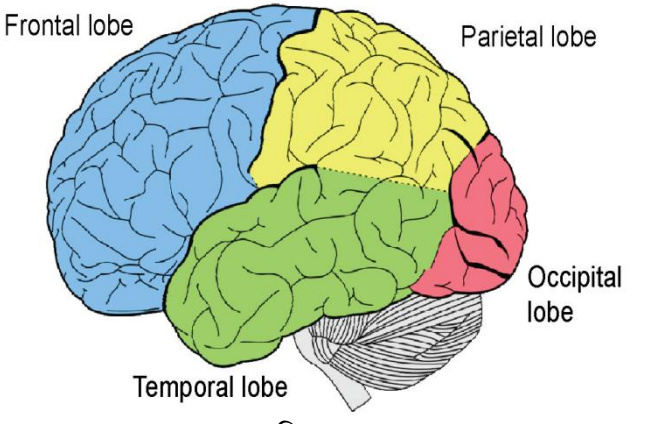

চিত্র-১২

মন (Mind) নামক বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি সৃষ্টিগত/জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারণ করে তা হলো–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)

২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memmory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (JealouSz), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

আধারটির শক্তির বিষয়গুলো সৃষ্টিগতভাবে বিভক্ত হয়ে সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশে নিম্নভাবে অবস্থিত–

ক. সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে (Frontal lobe) থাকা বিষয়সমূহ

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)
২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controllin power
৯. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

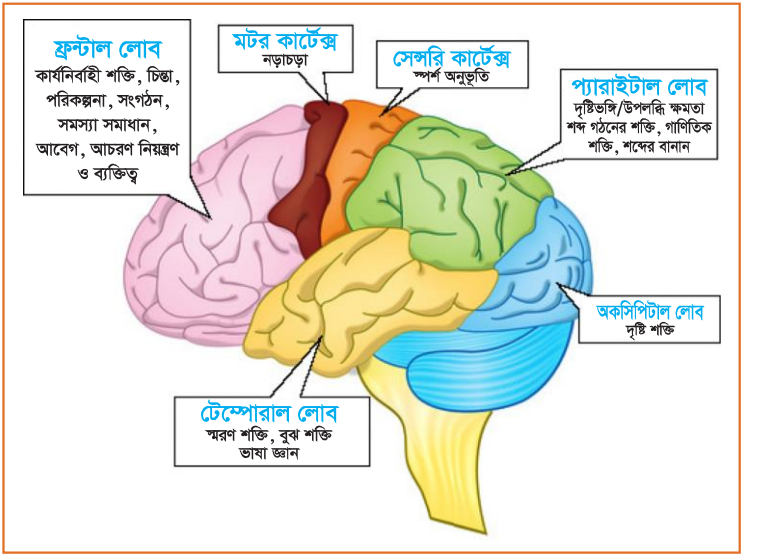

চিত্র-১৩

সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

খ. সম্মুখ ব্রেইনের Parietal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
২. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
৩. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
৪. বানান শক্তি (Spelling power)

গ. সম্মুখ ব্রেইনের Temporal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. স্মরণশক্তি (Memmory)
২. বুঝের শক্তি (Understanding power)
৩. ভাষা শক্তি (Languistic power)

আল কুরআনেও মানব শরীরে মনের অবস্থান সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত অভিন্ন তথ্য আছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য জানা না থাকার কারণে কুরআনের তরজমা ও তাফসীরে সঠিক অর্থটি আসেনি। মন শরীরের কোন স্থানে আছে তা কুরআন বিভিন্ন স্থানে যথার্থভাবে উল্লেখ করা আছে। তবে নিম্নের আয়াতটি থেকে বিষয়টি সবচেয়ে ভালোভাবে জানা যায়-

..... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

('ক্বলব' ও 'সদর' শব্দ দুটি অপরিবর্তিত রেখে) : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে ক্বলব যা আছে সদরে। (সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

আয়াতটির প্রচলিত অর্থ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা আছে বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডে)।

প্রচলিত অর্থের পর্যালোচনা : আয়াতটির প্রচলিত অর্থের তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্যের শতভাগ বিপরীত। তাই এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে (পরে আসছে) জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্য এবং কুরআনের ঐ বিষয়ের তথ্য অভিন্ন।

আয়াতটির প্রকৃত অর্থ : কুরআন ও হাদীসে قَلْبٌ (ক্বলব) শব্দটি বহুবার এসেছে। শব্দটির আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের প্রধান দুটি হলো–

১. Heart (হৃৎপিণ্ড), যা বুকের বাম দিকে থাকে।
২. মন (অন্তর/Mind)।

صَدْرٌ (সদর) শব্দটিও আল কুরআন ও হাদীসে বহুবার এসেছে। صَدْرٌ (সদর) শব্দের আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের প্রধান দুটি হলো–

১. বক্ষ।
২. সম্মুখ ভাগ।

প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান (চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞান) মতে– হার্ট (হৃৎপিণ্ড), অন্তর ও মনকে একই জিনিসের প্রতিশব্দ মনে করা হয় এবং আরবী 'ক্বলব' শব্দটির অর্থে প্রতিশব্দ হিসেবে ঐ তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করা হয়। আর তাই 'ক্বলব'-এর অবস্থান ধরা হয় বুকের বাম দিকে। আর মনে করা হয়- বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড), অন্তর বা মনে আছে জ্ঞান, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। প্রায় সকল তাফসীরকারক 'ক্বলব' শব্দটির অর্থ ও শারীরিক অবস্থান প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের অনুরূপ ধরেছেন।

প্রকৃত অনুবাদ (قَلْبٌ শব্দটির অনুবাদ মন এবং صَدْرٌ শব্দটির অনুবাদ সম্মুখ অংশ ধরে) : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন, যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

এ অনুবাদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্যের সাথে শতভাগ সংগতিশীল। তাই এটি গ্রহণযোগ্য হবে।

♣♣ এ দুটি উদাহরণসহ কুরআনে বর্ণিত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের অনেক তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– মানুষ সম্পর্কে নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান শুধুমাত্র কুরআনের আইনের প্রণেতারই আছে।

খ. মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীর নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ

কুরআনের আইন প্রণেতার পৃথিবী ও মহাকাশের সকল কিছু সম্বন্ধে নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান আছে তা সহজে বুঝা যায়, কুরআনে থাকা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আয়াতের বক্তব্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/সঠিক তথ্য মেলালে।

আর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যের সাথে মিলে যাবে কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতা'ক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। এটা কি তোমার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে।

তাই আয়াতটি অনুযায়ী– মানুষের শরীরের বাইরের ও ভেতরের বিষয় নিয়ে যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে কুরআন তত সত্য প্রমাণিত হবে। আর ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

এ আয়াতের বক্তব্য সত্য হওয়ার মানব শরীর সম্পর্কিত দুটি তথ্য আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। আর আয়াতটির বক্তব্য সত্য হওয়ার বিষয়ে মানব শরীরের ও মহাবিশ্বের অনেক প্রমাণ বর্তমানে আছে। যেমন– ভিডিও

ক্যামেরা, আণবিক শক্তি, যুদ্ধবিমান, পৃথিবী ও মহাকাশের সৃষ্টি, মদের অপকারিতা ইত্যাদি।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে **'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামক বইটিতে।

♣♣ সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়– জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষের আইন তা নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের আইন বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে জীবনের সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে পারবে। কিন্তু মানব রচিত আইন তা কখনই পারবে না।

মানদণ্ড-১.২
আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি

আইন প্রণয়নকারীর (ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা) পূর্বোল্লিখিত সকল বিষয়ের তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের অতীতে কী অবস্থা ছিল, বর্তমানে কী অবস্থা আছে এবং ভবিষ্যতে কী অবস্থা হবে তার পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আইন প্রণেতার দুর্বলতা থাকলে তার বানানো আইন কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে বাধ্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের পর্যালোচনা–

মানব রচিত আইন

মানব সমাজের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকাতো দূরের কথা একটি বিষয়েরও তিন কালের পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই তার পক্ষে কোনো বিষয়ে এমন কোনো আইন বানানো সম্ভব নয় যা চিরকাল চলবে। মানুষের আইন প্রণেতার এ দুর্বলতার জন্যও বিভিন্ন সময়ের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হবে বা হয়। এটি যুক্তিসংগত নয়।

কুরআনের আইন

জ্ঞানের স্থান-কালের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রণেতার অবস্থান কোথায় তা তিনি কুরআনে বহুবার জানিয়েছেন। ঐ ধরনের দুটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো–

তথ্য-১

. . . . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ . . . .

... ... তিনি জানেন মানুষের সামনে এবং পিছনে যা আছে। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত অনেক আয়াত কুরআনে আছে। এ সকল আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের আইনের প্রণেতা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই জানেন। অর্থাৎ তাঁর তিন কালের জ্ঞান আছে।

তথ্য-২

আগে উল্লিখিত সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মানুষ, পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। আর ঐ আবিষ্কার যদি সঠিক হয় তবে তা কুরআনের ঐ বিষয়ের বক্তব্যের সাথে মিলে যাবে। এ কথা যে সঠিক তা কিছু দিন পরপরই মানব সভ্যতা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে।

♣♣ তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা মহান আল্লাহর পক্ষেই শুধু সম্ভব সকল জিনিসের তিন কালের জ্ঞান পর্যালোচনা করে এমন আইন বানানো, যা দিয়ে সকল কালের মানুষ সমান ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানব রচিত আইন কোনোভাবেই যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর নয়। পক্ষান্তরে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-১.৩
আইন প্রণয়নকারীর সংখ্যা

আইন প্রণেতা একক সত্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, স্বাধীন চিন্তাধারা সম্বলিত বিভিন্ন সত্তা যদি আইন বানাতে বসে, তবে সবাই সম্পূর্ণ একমত হয়ে সকল আইন কখনই তৈরি করতে পারবে না। আর যদি বেশির ভাগ সত্তার মত অনুযায়ী কোনো আইন বানানো হয়, তবে যারা ঐ আইনের পক্ষে নয় তারা শতভাগ আন্তরিকতা সহকারে ঐ আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে না। অথবা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ আইনের বিপক্ষে কাজ করবে। এ অবস্থা যদি কোনো মৌলিক আইনের ব্যাপারে হয়, তবে তা দিয়ে মানুষের জীবন অশান্তিময় হতে বাধ্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন প্রণেতারা (পার্লামেন্ট, সিনেট, আইন পরিষদ সদস্য ইত্যাদি) একের অধিক দল ও সংখ্যার হয় এবং তাদের সকলেরই স্বাধীন চিন্তাধারা ও কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। তাই কোনো দেশের সকল আইন প্রণেতা শতভাগ একমত হয়ে ঐ দেশের আইন প্রণয়ন করেছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ফলস্বরূপ দেখা যায়– অনেক মৌলিক আইনের বাস্তবায়নের ব্যাপারেও বিরোধী সদস্যরা নানা ধরনের অসহযোগিতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি মানব রচিত আইনের নিরবচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ শান্তি দেওয়ার পথে একটি বিরাট বাধা।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের সংখ্যার ব্যাপারে বলেছেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

বলো, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।

(সুরা ইখলাস/১১২ : ১)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। অর্থাৎ আইন বানানো, সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি সকল ব্যাপারে তিনি অদ্বিতীয়। অন্য কারো এ বিষয়ে অংশীদারিত্ব নেই।

..... اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ .....

... ...বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।... ... ...

(সুরা ইউসুফ/১২ : ৪০)

ব্যাখ্যা : যেটি হুকুম সেটিই আইন। আবার যেটি আইন সেটিই হুকুম। তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আইন বানানোর সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই। অর্থাৎ তিনি একাই সব আইন তৈরি করেন। কারণ, মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে এমন আইন বানানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় নিখুঁত জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। ঐ জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার জন্য দরকারি সকল আইন প্রণয়ন করেছেন। অতঃপর সে আইন কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সে আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধিও (মুহাম্মাদ স.) পাঠিয়েছেন। তিনি নিখুঁতভাবে ঐ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েও দিয়ে

গেছেন। আর কুরআনে তিনি নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক আইন। এ তথ্যটি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

.....وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.....

... ... আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।... ... ...

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

.....مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ.....

... ... আমরা কিতাবে (কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি।... ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

কুরআনের আইনে অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার আইন বানানোর ব্যাপারে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা হলো– যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট আইন নেই, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য আইনের আলোকে তারা আইন বানাতে পারবে। ঐ সকল বিষয় হচ্ছে অমৌলিক বা ছোটোখাটো বিষয়। আর আইন তৈরির ব্যাপারে এ ক্ষমতাটুকু আল্লাহ এ জন্য ছেড়ে দিয়েছেন যে, ঐ ধরনের আইনে যদি কিছু ভুলও থাকে, তবে তাতে মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হওয়ার পথে বড়ো কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে আইন প্রণেতার সংখ্যার মানদণ্ডের দিক দিয়ে কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা মোটেই নয়।

মানদণ্ড-১.৪
আইন প্রণয়নকারীর নিরপেক্ষতা

প্রণীত আইন সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর হতে হলে আইন প্রণেতাকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ ন্যায়ের পক্ষে হতে হবে। অর্থাৎ তাকে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তা না হলে যে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল বা দেশে আইন প্রণেতার অবস্থান, মনের অজান্তে আইন বানানোর সময় তার প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে।

এ দৃষ্টিকোণের আলোকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রণেতা একজন মানুষ বা অনেক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংস্থা। মানুষ কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল বা দেশের অবশ্যই নাগরিক। তাই মানুষের মাধ্যমে তৈরি আইন কখনই ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাইতো দেখা যায়–

১. ধনিক শ্রেণির তৈরি আইন ধনীদের জন্য যেমন কল্যাণকর, গরিবদের জন্য তেমন নয়।

২. বঞ্চিত শ্রেণির তৈরি আইন (সমাজতান্ত্রিক আইন) ধনীদের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয়।

৩. এক দেশের লোকদের বানানো আইন অন্য দেশের লোকদের জন্য ক্ষতিকর।

৪. সাদা রঙের মানুষের তৈরি আইন, কালো রঙের মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয়।

৫. রাজবংশের তৈরি আইনে রাজবংশের সদস্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকেই।

৬. পুরুষের তৈরি আইন নারীদের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয় এবং নারীরা আইন তৈরি করলেও তা পুরুষের প্রতি সমান কল্যাণকর হবে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন–

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ .

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

(সুরা আল ইখলাস/১১২ : ৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি কারো মা-বাবা নন বা তাঁরও কোনো মা-বাবা নেই। অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন– বংশ, গোত্র বা আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়ের পক্ষে। আর যেহেতু তিনি কোথাও জন্মাননি তাই জন্মগতভাবে তিনি কোনো দেশের নাগরিকও নন। তিনি যেহেতু কারো থেকে জন্ম নেননি বা কাউকে জন্মও দেননি, তাই তিনি পুরুষ ও মহিলা কোনটিই নন।

..... وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۭ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ .....

... ... অথচ তিনিই সবকিছুর রব; আর প্রত্যেক ব্যক্তি (তা থেকে) কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না (প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী)। আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।

(সুরা আল আনআম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : রব শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। একটি অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনাকারী। কুরআনের আইনের প্রণেতা তাই এখানে প্রথমে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন (লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে থেকে) তিনি সকল মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকামী। এরপর তিনি তাঁর এই সমানভাবে কল্যাণ কামনার দুটো দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সে দিক দুটো হলো–

১. একজন মানুষ নিজে যা অর্জন করেছে তা ছাড়া অন্যকিছু তার ওপর তিনি চাপান না।

২. একজনের কৃতকর্মের বোঝা তিনি অন্যের ওপর চাপান না।

♣♣ তাই আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৫

আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শক্তি

আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি হতে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও অধিক। তা না হলে একটি আইন যদি কোনো এলাকা, দেশ বা পৃথিবীর মানুষের নিজস্ব স্বার্থের বিপরীত হয়, তবে তারা ঐ আইন মানতে চাইবে না এবং ঐ সত্তাকে উৎখাত করে ফেলবে বা ফেলতে চাইবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্থাৎ সরকারের শক্তি সারা বিশ্বের মানুষের শক্তির থেকে বেশি থাকাতো দূরের কথা, তার নিজ দেশের জনগণের শক্তির তুলনায়ও সবসময় বেশি থাকে না। তাই তো দেখা যায়, মানব রচিত আইনের সরকার সামরিক বা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়। আর তখন অন্য ধরনের আইন চালু হয়ে যায়।

কুরআনের আইন

নিজের শক্তির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রয়োগকারী সত্তা (আল্লাহ) যা ঘোষণা করেছেন–

..... اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا .....

... ...সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর।... ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৬৫)

..... وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

... ...আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৪)

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ .

আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারীও নেই।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৩১)

... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ .

... ... আর তার কুরসি (ক্ষমতার গদি/ব্যাপকতা) আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আর এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ ও সুমহান।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এআয়াতগুলোসহ আরও অনেক আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআনের আইনের প্রণেতার শক্তি পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। তাই পৃথিবীর সকল মানুষ একসাথে মিলে চেষ্টা করলেও আল্লাহর সরকারকে উৎখাত করতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আইনের প্রণেতা যদি এতই শক্তিশালী হয়ে থাকেন, তবে তিনি কেন শক্তি প্রয়োগ করে সকলকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করেন না। এর উত্তর হলো– কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করা বা না করার ভিত্তিতে মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। অতঃপর সে পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ইনসাফসহকারে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান।

কাউকে কোনো কিছু মানা বা না মানার ভিত্তিতে পরীক্ষা নেওয়া এবং সে পরীক্ষার ভিত্তিতে ইনসাফ সহকারে শাস্তি ও পুরস্কার দিতে চাইলে তাকে

অবশ্যই মানা বা মানার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হবে। এটা Common sense-এর চিরসত্য রায়। তাই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করতে বাধ্য করার মতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরআনের আইন প্রণেতা বিশেষ কারণ ছাড়া তাঁর সে শক্তি প্রয়োগ করেন না।

কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি যখন তাঁর আইন অমান্য করতে করতে একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই শুধু তিনি নিজ তৈরি প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাঁর সেই শক্তি প্রয়োগ করেন। তবে সে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠী বা জাতিকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করার পরিবর্তে তিনি সাধারণত পৃথিবী থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতিকে তিনি এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন বলে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৬
আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্ব

আইন প্রণয়নকারীকে হতে হবে চিরস্থায়ী। তা না হলে নতুন আইন প্রণয়নকারী এসে আগের প্রণেতার অনেক আইন অকল্যাণকর, যথেষ্ট কল্যাণকর নয় বা পছন্দ নয় বলে পাল্টিয়ে ফেলবেন। ফলে বিভিন্ন সময়ের মানুষ একই কাজের জন্য বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এটা যুক্তিসংগত নয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রণয়নকারী (সরকার) ক্ষণস্থায়ী। আর নতুন সরকার এসে আগের সরকারের অনেক আইন পরিবর্তন করে ফেলে। এটি একটি বাস্তব সত্য। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানব রচিত আইনে বিভিন্ন সময় বা কালের মানুষ একই কাজের জন্য বিভিন্নভাবে বা মাত্রায় কল্যাণ বা শাস্তি পায়। এটি মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

কুরআনের আইন

স্থায়িত্বের ব্যাপারে কুরআনের আইনের প্রণয়নকারী তাঁর অবস্থানের কথা বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ বিষয়ক একটি বক্তব্য হলো–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۬ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ ....

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের প্রণয়নকারীর আইনের প্রণেতা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চিরস্থায়ী এবং তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও স্পর্শ করে না।

♣♣ তাই আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষের আইন যুক্তিসংগত নয় কিন্তু কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত।

মানদণ্ড-১.৭

আইন প্রণয়নকারীর কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি

আইন প্রণয়নকারী বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতি শুধু একটি দেশ, শুধু মানুষ বা শুধু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তা হতে হবে মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে।

কারণ–

১. আইন যদি শুধু একটি দেশের মানুষের ওপর চলে তবে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হবে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ অভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্নভাবে শান্তি বা শাস্তি (কষ্ট) পাবে। এটা যুক্তিসংগত নয়।

২. পৃথিবীর অন্য যে সকল সৃষ্টি (পশু-পক্ষী, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) আছে তার ওপর যদি আইন প্রণেতার আইন বা কর্তৃত্ব না চলে তবে ঐ সকল সৃষ্টির ওপর নিশ্চয় অন্য প্রণেতার আইন চলবে। সে আইন মানুষের জন্য প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে ঐ সকল সৃষ্টি দিয়ে মানুষের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে। এ রকম হলে মানুষের জীবন মোটেই শান্তিময় হবে না।

৩. মহাকাশে যদি অন্য সত্তার আইন চলে তবে সে আইনও পৃথিবীর মানুষের আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে মহাকাশের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির আচরণ মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়ে অকল্যাণকরই হবে। আর তাহলে মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

তাই কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আইন যুক্তিসংগত ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে হলে সেটির বিস্তৃতি হতে হবে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে।
২. অন্য সকল সৃষ্টির জন্য প্রণীত আইন হতে হবে মানুষের জন্য প্রণীত আইনের সম্পূরক। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই অন্য সকল সৃষ্টির আইন রচিত হতে হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন যে দেশে রচিত হয়, সে দেশের মানুষের ওপরেই শুধু কার্যকর হয়। অর্থাৎ মানব রচিত আইনে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইনে শাসিত হয়। তাই ঐ আইনে, অভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে শাস্তি বা কষ্টপ্রাপ্ত হয়। আর মানব রচিত আইন মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টির ওপর প্রযোজ্য হবে বা মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি মানুষের কর্তৃত্বের মধ্যে এসে যাবে, এটা কল্পনাও করা যায় না।

কুরআনের আইন

কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নানা ধরনের বক্তব্য কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। তার কয়েকটি হচ্ছে–

..... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ .....

... ... আর তার কুরসি (ক্ষমতার গদি/ব্যাপকতা) আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতার বিস্তৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ জুড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকাশে মানুষসহ অন্য যত সৃষ্টি আছে, সে সকল সৃষ্টি জুড়েই হচ্ছে তাঁর আইনের প্রয়োগ স্থলের বিস্তৃতি।

..... وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

... ...অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান (সবই) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং তাঁর দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৮৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাঁর কাছে বাধ্যতামূলকভাবে আত্মসমর্পণ করে আছে। অর্থাৎ সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর আইনের অধীন।

মানুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিতে একটু ব্যতিক্রম আছে এবং তাও কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সে ব্যতিক্রমটি হলো– কুরআনের আইনের প্রণেতা মানুষের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Organs) কোষগুলোকে (Cells) অন্য সৃষ্টির মতো বাধ্যতামূলক তাঁর আইনের অধীন করে রেখেছেন। সে আইন ভাঙলেই রোগাক্রান্ত হতে হয়। অর্থাৎ শারীরিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে তা করেননি। কারণ, প্রণীত আইন মানা বা না মানার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে তিনি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান। তাই ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্যতামূলক অধীন করে দিলে সেটি করা যৌক্তিক বা ন্যায়সংগত হয় না।

মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে অধীন করা হয়নি। এটি আল্লাহ বিভিন্নভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। দুটি স্থানের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো–

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .

নিশ্চয় আমরা তাকে পথের সন্ধান দিয়েছি, (এখন) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।

(সুরা আদ্ দাহর/৭৬ : ৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে বলে দিয়েছেন– তিনি মানুষের জীবন কল্যাণকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইন প্রণয়ন করে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে আইন মানা বা না মানার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্য করেননি। তাই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর দেওয়া আইন মেনে চলে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। অথবা তাঁর দেওয়া আইন অমান্য করে দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তিতে পড়তে পারে।

..... وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ .....

... ... যদি আল্লাহ (অতা'ক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের সকলকে অবশ্যই সঠিক পথে একত্রিত করতেন ... ...

(সুরা আল আনআম/৬ : ৩৫)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের আইনের প্রণেতা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি চাইলে যারা তাঁর আইন মানতে চায় না তাদেরকে তাঁর আইন মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এটি তার নীতি নয়।

আর পৃথিবীর সকল কিছু যে মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ لَکُمۡ مَّا فِی الۡاَرۡضِ جَمِیۡعًا ٭ ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ ....

তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৯)

কুরআনের আইনের প্রণেতার কর্তৃত্বের পরিধি বিস্তৃতির ব্যাপারে উপরোক্ত কথাগুলো যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি কুরআনের আইন প্রণেতার বানানো প্রাকৃতিক আইন মেনে চলছে তাই সেখানে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ বা অশান্তি নেই।
২. মহাকাশ ও পৃথিবীর (মানুষ বাদে) সব সৃষ্টির জন্য তৈরি প্রাকৃতিক আইনগুলো এমন যে, ঐ সব সৃষ্টি দিয়ে মানুষের কোনো না কোনো কল্যাণ হয় (Ecological balance)।
৩. অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য।
৪. মানুষের শরীরের কোষগুলো (Cells) আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক আইন (Naturel Law) মেনে চলতে বাধ্য। সে আইনের কোনো ব্যতিক্রম হলেই কোষগুলোর মধ্যকার শান্তি নষ্ট হয় এবং তখন অশান্তি অর্থাৎ রোগের সৃষ্টি হয়।
৫. মানুষের চিন্তা-শক্তি ব্যবহার করে কাজ করার স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষ কুরআনের আইন অমান্য করেও পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারছে।

♣♣ তাই সহজেই বলা যায়– আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর। কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৮
মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার

আইনের বিস্তৃতি হতে হবে মানুষের জীবনের যত দিক আছে তার সকল দিকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-সন্ধি, পেশাগত, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল দিকে। আর এ সকল দিকের মধ্যে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি নিয়ে পরিবার। পরিবার নিয়ে সমাজ। সমাজ নিয় দেশ। দেশ নিয়ে পৃথিবী। তাই ব্যক্তি মানুষ যদি ভালো হয়ে যায় তবে সমাজ, দেশ বা পৃথিবী ভালো তথা কল্যাণময় হতে বাধ্য।

একজন ব্যক্তি ভালো হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে সব থেকে বড়ো ভূমিকা রাখে তার পরিবার। জীবনের প্রথম কিছু বছর একটি মানব শিশু তার পরিবারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে। ঐ বছরগুলোতে যে শিক্ষা সে পায়, সারাটি জীবন সে শিক্ষার কিছু না কিছু প্রভাব তার ওপর অবশ্যই থাকে। তাই আইনের বিস্তৃতি ও আনুপাতিক হার, মানবজীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের বিস্তৃতি জীবনের সকল দিকে থাকলেও সেখানে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের দিকে অধিক নজর বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি যুক্তিসংগত নয়। ব্যক্তি খারাপ হয়ে গড়ে ওঠলে রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা কঠিন বা অসম্ভব হয়।

কুরআনের আইন

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সেখানে মানুষের জীবনের সকল দিক পরিচালনার জন্য আইন আছে। আবার এটাও দেখা যায়– কুরআনে ব্যক্তি ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে যত বক্তব্য, আলোচনা বা আইন আছে, অন্য বিষয় নিয়ে তা নেই। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে অন্য সকল দিকের আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

♣♣ তাই জীবনের বিভিন্ন দিকের আইনের বিস্তৃতি ও তার গুরুত্বের আনুপাতিক হারের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-১.৯

আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় প্রণীত আইনে না থাকা

প্রণীত আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে এমন সকল বিষয় নিষিদ্ধ থাকতে হবে। কারণ, কোনো একটি কাজ করার নির্দেশ দেওয়া এবং সাথে সাথে সে কাজটি অমান্য করতে উৎসাহিত হয় এমন কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেওয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়। তাই এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক আইন দেখা যায়, যা পরস্পর বিরোধী। যেমন–

১. ধর্ষণ (Rape) করা মানব রচিত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু সাথে সাথে সেখানে মানুষের যৌন বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এমন কর্মকাণ্ড (মহিলাদের অর্ধ নগ্ন পোশাকে চলাফেরা করা, যৌন সুড়সুড়ি দেয় এমন লিফলেট, পোস্টার, বই, সিনেমা, নাটক, গান ইত্যাদি) নিষিদ্ধ নয়।

২. মদ খেয়ে গাড়ি চালানো বা অসামাজিক কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মদ উৎপাদন করা, বেচাকেনা করা ও খাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

৩. সকল শিশু সৎ নাগরিক বা নীতিবান মানুষ হয়ে গড়ে ওঠুক বলে কামনা করা কিন্তু অন্যদিকে ভিডিও গেম্‌স, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে গোলাগুলি, মারামারি, কাটাকাটি, চোরাকারবারী, মানুষ ঠকানো বা ফাঁকি দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক প্রচারের অনুমতি দেওয়া।

কুরআনের আইন

কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বিধান নেই। এ আইনে অপরাধ করা বা অপরাধে সহযোগিতা করা বা অপরাধ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাও সমান অপরাধ। অর্থাৎ যে কাজটি নিষিদ্ধ সেই কাজকে উৎসাহিত করে এমন সকল কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ।

যেমন–

১. ধর্ষণ (Rape) কুরআনের আইনে নিষিদ্ধ। সাথে সাথে সেখানে মানুষের যৌন বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এমন সকল কিছুই নিষিদ্ধ।

২. মদ খাওয়া নিষিদ্ধ। সাথে সাথে সেখানে মদ উৎপাদন ও বেচাকেনাও নিষিদ্ধ।

♣♣ তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অধিক যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-২.১
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হতে হবে আইন প্রণয়নকারীর প্রতি শতভাগ আনুগত্যশীল। অর্থাৎ তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও ক্ষমতা থাকবে না। তা থাকলে কোনো না কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো না কোনো আইন সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করবেই। আর যারা দ্বিমত পোষণ করবে তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আইন বাস্তবায়নের চেষ্টাতো করবেই না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ফলে ঐ আইন তার প্রণেতার ইচ্ছা অনুযায়ী শতভাগ শান্তি দিতে পারবে না। এ অবস্থা যেকোনো আইন কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে একটা বিরাট বাধা।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানুষ এবং তাদের সকলের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। তাই সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ সরকারের প্রতি মনে-প্রাণে শতভাগ আনুগত্যশীল হওয়া অসম্ভব। এ কারণে, একটি সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সকল আইন বাস্তবায়নের জন্য মনে-প্রাণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে এমনটি হওয়া অসম্ভব। বরং অনেকে আইন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দুই ধরনের–

- মানুষ
- ফেরেশতা

মানুষের দায়িত্ব শুধু দুনিয়ায় আর ফেরেশতাদের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে।

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তরা মানুষ হলেও তাদেরকে প্রথমে ঈমান আনার মাধ্যমে কুরআনের আইন প্রণেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার ঘোষণা দিতে হয়। অর্থাৎ তাদের সকলকে ঘোষণা দিতে হয় যে– কুরআনের আইন প্রণেতার তৈরি করা সকল আইন মানা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে তারা মনে-প্রাণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। আর ঈমানের দাবি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিরা সবাই মনে-প্রাণে এটাও বিশ্বাস করে যে, তাদের সকল কাজ নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর পর সেই নিরীক্ষণ পর্যালোচনা করে নিখুঁত পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

তাই মানুষ হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি হলেও মানুষ রচিত আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তুলনায় তারা বেশি আনুগত্যশীল ও দায়িত্বশীল হবেন এটাই যুক্তিসংগত। যারা মুনাফিক (মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে নয়) তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তবে এই মুনাফিকদের নিকৃষ্টতম জাহান্নামে যেতে হবে এ ঘোষণা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন।

আইন বাস্তবায়নের জন্য কুরআনের আইন প্রণেতার অন্য সৃষ্টি ফেরেশতাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনের আইন প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাশক্তি বা ক্ষমতা নেই।
২. তাদের মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া, প্রকৃতির ডাক, ক্লান্তি, বিশ্রাম, ঘুম, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি নেই।
৩. সারাক্ষণ কুরআনের আইন প্রণেতার আনুগত্যশীল থাকা এবং যে কাজ তাদের যেভাবে করতে বলা হয়েছে সে কাজ সেভাবে করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

ওপরের কথাগুলো কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের মাধ্যমে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ .

তারা রাত ও দিন তাঁর তাসবীহ করে তারা শিথিল হয় না।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ২০)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ .

আর আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু আছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহংকার করে না।
(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৯)

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .....

... ... যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাগণ যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।
(সুরা আত তাহরীম/৬৬ : ৬)

অন্যদিকে পরকালের জগতে সকল কাজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে কুরআনের আইন প্রণেতার এই ফেরেশতা কর্মচারীরা।

দুনিয়ায় ঐ ফেরেশতা কর্মচারীদের কিছু কাজ হচ্ছে–

১. মানুষ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তারা মানুষের কল্যাণে আসে।
২. মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা এবং সে নিরীক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
৩. আল্লাহর তৈরি করে দেওয়া প্রাকৃতিক ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন অমান্য করার দরুন যে বিপদ মানুষের ওপর আসার কথা, তার অনেকটিকে ঘটতে না দেওয়া। এ কথাটা আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ .

আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং অনেক বিপদ-আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন (ঘটতে দেন না)।
(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৩০)

৪. আইন অমান্য করতে করতে সীমা অতিক্রম করে গেলে কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতিকে শাস্তি দেওয়া বা ধ্বংস করে দেওয়া।
৫. শত্রুদের মাধ্যমে আইন মান্যকারীদের ওপর অতিমাত্রায় বিপদ আসলে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করা।

♣♣ তাহলে আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-২.২
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা

আইন প্রণেতার মতো আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। তা না হলে, নিরপেক্ষ থেকে তারা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবে না।

এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তথা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল, মতবাদ বা দেশের অবশ্যই হবে। তাই তাদের পক্ষে ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে, আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই তো কম হোক বা বেশি হোক, পৃথিবীর সকল দেশে দেখা যায়–

১. এক দল বা মতবাদে বিশ্বাসী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য দল ও মতবাদে বিশ্বাসী জনতার ওপর সমান আচরণ করতে পারে না।
২. এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার দেশের জনগণ ও অন্য দেশের জনগণের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
৩. এক লিঙ্গের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
৪. এক বর্ণের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একই দেশের বা অন্য দেশের ভিন্ন বর্ণের মানুষের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ করতে পারে না।
৫. এক বংশ বা গোত্রের সরকারি কর্মচারীরা অন্য বংশ বা গোত্রের লোকদের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।

আর যেহেতু মানুষের আইনের প্রয়োগ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায়, তাই এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ হওয়ার কোনো সুযোগও থাকে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও মানুষ। কিন্তু ঐ আইনে প্রকৃতভাবে বিশ্বাসী লোকদের মানসিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়– যেন তারা লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করার উপযোগী

হয়। তারপরও এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না যে, তাদের সকলেই ঐ সকল বিষয়ে শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করে। তবে কুরআনের আইনের এ অভাবটা পূরণ হয়ে যাবে ঐ আইনে থাকা চূড়ান্ত বিচারের ব্যবস্থায়। যেটি অনুষ্ঠিত হবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার (কিয়ামত) পর।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.১

বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া

আইন নিখুঁত হলেই তা মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে পারবে এমনটি নয়। এর জন্য থাকতে হবে একটি নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা। আর বিচার নিখুঁত ও পরিপূর্ণ হতে হলে তা হতে হবে দুই স্তরে। যেমন–

১. প্রাথমিক স্তর (দুনিয়ার স্তর)।
২. চূড়ান্ত স্তর (পরকালীন স্তর)।

প্রাথমিক স্তর

এ স্তরের বিচার হতে হবে দুনিয়ায় মানুষের জীবদ্দশায়। আর এ স্তরটি উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা–

১. এটি না থাকলে যারা চূড়ান্ত বিচারে বিশ্বাস করে না বা করবে না, তারা আইন মানতে চাইবে না। ফলে তারা আইন অমান্য করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করবে।
২. চূড়ান্ত বিচার কতদিন বা কত হাজার বছর পরে হবে তা মানুষ জানে না। বিচার দেরিতে হলে সে বিচারের প্রভাব (Effect) মানুষের ওপর তেমন পড়ে না। তাই তো আমরা জানি ও মানি– Justice delayed justice denied (বিচার বিলম্বিত করা বিচার অস্বীকার করার সমান)।

চূড়ান্ত স্তর

এ বিচার হতে হবে পরকালে। অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস (কিয়ামত) হয়ে যাওয়ার পর। ওপরে উল্লিখিত ও পরে আসা সকল বিষয় পূরণ করে নিখুঁত বিচার দুনিয়ায় করা সম্ভব নয়। তাইতো দুনিয়ার বিচারে দেখা যায়–

১. বহু মানুষ সৎপথে থেকে জীবন পরিচালনা করার জন্য অনেক কষ্টসহকারে জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ সততার জন্য কোনো পুরস্কার না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
২. অনেক মানুষ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদিসহ অত্যন্ত দাপটের সাথে শান্তিতে জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ অসৎ কাজের জন্য শাস্তি না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
৩. যথাযথ সাক্ষী-প্রমাণ বা তথ্য না থাকার দরুন অনেক অপরাধীর শাস্তি হয় না বা হলেও কম হয়।
৪. ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীর জন্য অনেক নির্দোষ মানুষের শাস্তি হয় বা বেশি শাস্তি হয়।

তাই দুনিয়ার বিচারের সাথে চূড়ান্ত তথা পরকালীন বিচার থাকতে হবে। চূড়ান্ত বিচারে যা হবে–

১. দুনিয়ার বিচারে যারা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছে তারা ইনসাফ সহকারে যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি পেয়ে যাবে।
২. যে সকল আমল (কর্ম) চলতে থাকে (আমলে জারিয়া) তার পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি মানুষ পেয়ে যাবে।

বিচার ব্যবস্থার স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে দুনিয়ার বিচার আছে। কিন্তু পরকালীন বিচার নেই।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে উভয় স্তর আছে। তাই দুনিয়ার শাস্তি থেকে কেউ কোনো কারণে বেঁচে গেলে পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচতে পরবে না।

এ কথাটি কুরআনের আইন প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

তবে কি যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

(সুরা আল আনকাবুত/২৯ : ৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– দুনিয়ায় যারা পাপ কাজ করছে তাদের এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে

তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবেন না। দুনিয়ায় তাঁর আইনে থাকা শাস্তি থেকে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ বেঁচে যেতে পারলেও চূড়ান্ত বিচারের দিন তারা কোনো মতেই বাঁচতে পারবে না।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.২

বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া

বিচার নিখুঁত হতে হলে বিচারককে অত্যন্ত বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে বিচার হয় এক স্তরে তথা শুধু দুনিয়ায় এবং বিচারক হয় মানুষ। কোনো মানুষ শতভাগ বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। তাই সকল বিচারে কম-বেশি দুর্বলতা স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে বিচারের দুনিয়ার স্তরে বিচারক থাকবে মানুষ। তাই সেখানে মানব রচিত আইনের মতো দুর্বলতা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। কারণ, এখানে যিনি বিচারক হবেন তিনি তার বিচার কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন। এরপরও সেখানে যে দুর্বলতা থেকে যাবে তা চূড়ান্ত বিচার তথা পরকালীন বিচারে শুধরিয়ে যাবে। কারণ, ঐ বিচারের বিচারক হবেন মহান আল্লাহ। যিনি শতভাগ বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৩

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম

মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত করা

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম কী হবে তা শুধু প্রণয়ন করে রাখলেই চলবে না। সেগুলো মানুষ জানতে পেরেছে, এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। তাই এ বিষয়গুলো মানুষকে জানানোর জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা আছে তার সবগুলো প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, জানা না থাকলে মানার প্রশ্ন আসে না। আবার না জানার কারণে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। অন্যদিকে ঐ বিষয়গুলো জানতে পারলে মানুষ আইন মানতে উৎসাহিত হবে এবং অমান্য করার সাহস পাবে না।

এ ব্যাপারে মানব রচিত ও কুরআনের আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে, আইন সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলো সকল মানুষ যাতে জানতে পারে সে লক্ষ্যে তেমন ব্যাপক কোনো ব্যবস্থা সাধারণত নেওয়া হয় না। সকল মানুষের জন্য তা জানা বাধ্যতামূলকও করা হয় না। তাই তো দেখা যায়–

১. মানব রচিত আইনে, আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষ ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখে না।

২. আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও তাদের নির্দিষ্ট অংশের (Sub Speciality) আইনগুলোই শুধু ভালো জানে।

কুরআনের আইন

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি না জানার কারণে কেউ যদি আইন অমান্য করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া কুরআনের আইন প্রণেতার নীতি নয়। তথ্যটি পরিষ্কারভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .....

... ... আর আমরা রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۖ .

আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।
(সুরা আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

এটি এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুমের কাজ করেন না।

(সুরা আল আনআম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়– আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি যে ব্যক্তি কোনোভাবে জানতে পারেনি, তাকে আইন না মানার জন্য শাস্তি দেওয়া আল্লাহর নীতি নয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পৃথিবীর সকল মানুষকে পরকালে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ভিত্তিতে সকলে যথাযথ পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে তাঁর প্রণীত আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি জানার কোনো না কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই করেছেন।

চলুন এখন জানা যাক, মহান আল্লাহ উল্লিখিত বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা করেছেন–

তথ্য-১

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ .

আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো– নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন- আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাকে 'রব' মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানব রুহ সেচ্ছায় সে অঙ্গীকার করেছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো– নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নং কারণ হলো– মানুষ যাতে কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানতো না। তাই রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন গুনাহ করেছে। কারণ, না জানার জন্য কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে আল্লাহর–

১. সকল ধরনের (সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার) তৌহিদ।
২. সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– রুবুবিয়াত সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল বিষয় সরাসরি জানিয়ে অঙ্গীকারটি নেওয়া হয়েছিল কি না?

প্রশ্নটির উত্তর– রুবুবিয়াত সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল বিষয় সরাসরি জানিয়ে অঙ্গীকারটি নেওয়া হয়নি। এ তথ্যটি কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে–

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ؕ .

(আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ৫)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ؕ .

যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনায়, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ

করে, তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা আগে (জন্মগতভাবে) জানতে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৫১)

..... فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

... ... এরপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা (Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

তাই সুরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. রুহের জগতে আল্লাহর রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ অমান্য না করার ব্যাপারে সরাসরি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল।

২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয়ে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল তা হলো– যুগে যুগে রুবুবিয়াতের সকল বিষয়ের নির্ভুল তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে যাবে। সে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মানুষকে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল কিছু নির্ভুলভাবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন রুবুবিয়াত বিরোধী শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হয়ে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-২

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ۚ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ .

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে রুহের জগতে অঙ্গীকার নেওয়ার ২ নং কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো– কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে, রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় তাদের বাপ, দাদা,

আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে তারা তা করেছিল। তাই পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের ভুলের কারণে তাদেরও কি ধ্বংস তথা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে? এ কথা বলার সুযোগ থাকলে অনুসরণের মাধ্যমে শিরক করার জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হবে না।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

ক. রুহের জগতে মহান আল্লাহ সকল মানব রুহ থেকে ২য় যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা হলো– মানুষ বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে শিরক করবে।

খ. অঙ্গীকারটি নেওয়ার সময় আরও জানিয়ে দেওয়া হয়–

১. অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে করা শিরক নিয়ে পরকালে আসলে ধ্বংস তথা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে।

২. অন্ধ অনুসরণ যেন না করতে হয় সে জন্য সকল মানুষকে তিনি জ্ঞানের একটি উৎস দেবেন। জ্ঞানের সে উৎসটি হলো Common sense/আকল/বিবেক।

উৎসটিকে যে পদ্ধতিতে মানুষকে দেওয়া হয়েছে–

১. প্রথমে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ উৎসটির বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার সকল রুহকে শিখিছে দেন। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

অতঃপর তিনি আদমকে সকল ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, আর বললেন– তোমরা আমাকে ঐ সকল ইসম সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

২. এরপর মহান আল্লাহ 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে উৎসটিকে সকল মানব ভ্রূণের ব্রেইনে দিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

মনের কসম এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭-৮)

৩. যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের মতো উৎসটিকে জন্মগতভাবে দেওয়া হয়েছে বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও নীতিমালা (Programme)।

অন্যদিকে আইন তথা ইসলামের বিধি-বিধান সকলের জ্ঞানের আওতায় আসা নিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ অন্য যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তা হলো–

১. যুগে যুগে সকল মৌলিক আইন– নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

২. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন) করেছেন।

৩. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা মু'মিনের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবে কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা শয়তানের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহর কাজ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

৪. কুরআনের জ্ঞান যাতে কোনো মুসলমান ভুলতে না পারে সে জন্য দিনে পাঁচ বার কুরআনের কিছু অংশ সালাতে পড়া বাধ্যতামূলক করেছেন।

৫. আল কুরআনের তথ্য যার জানা আছে, তার জন্য অপরকে সে তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করেছেন। আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা কারণে তা অপরকে না জানানোর জন্য কঠিক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

৬. আল্লাহর কিতাবের আইনগুলো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যা করে ও বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে প্রতিনিধি (নবী-রসুল) পাঠিয়েছেন।

♣♣ তাই আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৪
আইন মানা বা না মানার বিষয়টি
নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা

আইন মানা বা না মানার ওপর ভিত্তি করে যদি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে আইন মানা বা না মানার বিষয়টি অবশ্যই নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। এটি একটি চিরসত্য ও সহজ বোধগম্য বিষয়। তাই পৃথিবীর সকল সরকারই তা করে থাকে। কিন্তু নিরীক্ষণের ভিত্তিতে যদি যুক্তিসংগত, ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে সে নিরীক্ষণকে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ নিরীক্ষিত হওয়া।
২. বাহ্যিক কাজের সাথে মনের অবস্থাও নিরীক্ষণ করা।
৩. নিরীক্ষণের পদ্ধতিটি নিখুঁত হওয়া।
৪. যে সকল কাজের ফলাফল চালু থাকে (আমলে জারিয়া), সে সকল কাজের নিরীক্ষণ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চালু থাকা।

চলুন এখন নিরীক্ষণের এ শর্তগুলো নিয়ে উভয় আইনের অবস্থান পর্যালোচনা করা যাক–

১. দিন ও রাত এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ নিরীক্ষিত হওয়া

একজন মানুষের পুরো জীবন নিরীক্ষণ করে যদি যুক্তিসংগতভাবে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে তার দিন ও রাত এবং প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করতে হবে। তা না হলে তার সকল কাজকে মূল্যায়ন করা হবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিরীক্ষণ করা হয় মানুষ দিয়ে গঠিত সরকারের বিভিন্ন সংস্থার (পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদি) মাধ্যমে। ঐ সকল সংস্থার সদস্যদের মাধ্যমে একটি দেশের সকল মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব। তাই পৃথিবীর কোনো সরকার বা সংস্থা তা করতে পারার দাবিও করে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর সরকার মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবে দুটো স্তরে, প্রাথমিক ও চূড়ান্ত। প্রাথমিক স্তর হবে দুনিয়ায়। আর চূড়ান্ত স্তর হবে দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরকালে। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন– প্রথম স্তরের বিচারে নিরীক্ষণ ও বিচার করবে মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরের বিচারের জন্য মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করবে তাঁর নিয়োগকৃত কর্মচারীরা (ফেরেশতারা)। আর ঐ স্তরে বিচার করবেন তিনি নিজে।

প্রাথমিক স্তরে নিরীক্ষণ করবে মানুষ। তাই কুরআনের আইনের প্রাথমিক স্তরের নিরীক্ষণে দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বলতা থাকবে। তবে তা মানব রচিত আইনের তুলনায় কম হবে। কারণ, নিরীক্ষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরকালের জবাবদিহিতার ভয় থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের জন্য যে নিরীক্ষণ করা হবে তাতে কোনো দুর্বলতা থাকবে না।

চূড়ান্ত বিচারের তথ্য সংগ্রহের স্থান, কাল ও পাত্রের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রণেতার অনেক বক্তব্যের দুটি হলো–

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

আর অবশ্যই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ। (তারা) সম্মানিত লেখকগণ (রের্কডকারী)। তারা জানে তোমরা কী করো।

(সুরা আল ইনফিতার/৮২ : ১০-১২)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ .

তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানেন।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১৯)

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কিন্তু মানুষের আইন তা মোটেই নয়।

২. বাহ্যিক কাজের সাথে মনের অবস্থাও (Motive) নিরীক্ষণ করা

কৃত কাজের জন্য মানুষকে সুবিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে কাজটি করার সময় তার মনের অবস্থা কী ছিল তা সঠিকভাবে জানা একান্তভাবেই দরকার। অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে, না দুর্ঘটনাবশত কাজটি হয়ে গিয়েছে, তা জানা খুবই দরকার। কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের পুরস্কার বা শাস্তি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাবশত ঘটে যাওয়া কাজের পুরস্কার বা শাস্তি কখনই সমান হতে পারে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানুষের মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করার মতো কোনো প্রযুক্তি আগে মানব সভ্যতার জানা ছিল না। বর্তমানে আবিষ্কার হয়েছে এবং এখনো সেটি প্রাথমিক স্তরে। ভবিষ্যতে এটি উন্নত হলেও তা দিয়ে সকল মানুষের প্রতিটি কাজ করার সময় মনের অবস্থা কী ছিল তা নিরীক্ষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তাই মানব রচিত আইনে বিচারের সময় মনের অবস্থা সঠিকভাবে যাচাই করে সুবিচার করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না এবং ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের সময় মানুষের মনের অবস্থা পর্যালোচনা করে সুবিচার করার ব্যাপারে মানব রচিত আইনের মতো দুর্বলতা থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের (পরকালীন বিচার) সময় ঐ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা থাকবে না। কারণ, পরকালীন বিচারে, প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিল সেটি নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। আর প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এটি কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের বহুস্থানে জানিয়ে দিয়েছেন। সে বক্তব্যের কয়েকটি হলো নিম্নরূপ–

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ .

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন। আর আল্লাহ সদরে থাকা বিষয়াদিও খুব ভালোভাবে জানেন।

(সুরা আত তাগাবুন/৬৪ : ৪)

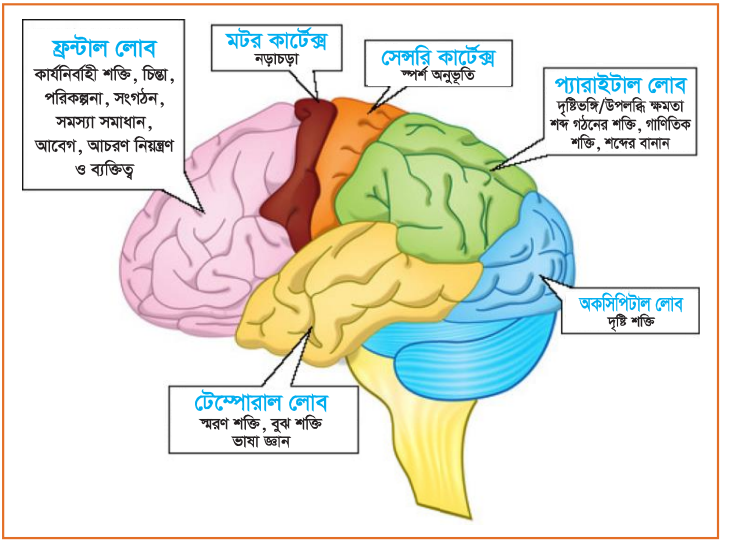

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে।

২. মানুষের প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কাজ তিনি জানেন বা জানতে পারেন।

৩. প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিল তাও তিনি জানেন তথা নিরীক্ষণ করেন বা নিরীক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ .

আর নিশ্চয় তোমার রব অবশ্যই জানেন তাদের সম্মুখ সদরে যা তারা গোপন করেও প্রকাশ করে তা ।

(সুরা আন নামল/২৭ : ৭৪)

..... وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ .....

... ... আর তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৪)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন– দুনিয়ায় কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থা (Motive) কী ছিল তা তার গোয়েন্দারা (ফেরেশতা) নিরীক্ষণ করছে ও রেকর্ড করে রাখছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন ঐ সকল রেকর্ড পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার করে তিনি পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

এভাবে কুরআনের আরও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে– প্রতিটি কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থাও আল্লাহ নিরীক্ষণ করাচ্ছেন বা করছেন।

♣♣ তাহলে নিরীক্ষণ ব্যবস্থার আলোচ্য দৃষ্টিকোণ (মনের অবস্থা নিরীক্ষণের দৃষ্টিকোণ) থেকেও মানব রচিত আইন যুক্তিসংগত নয় কিন্তু কুরআনের আইন যুক্তিসংগত।

৩. নিরীক্ষণের পদ্ধতি নিখুঁত হওয়া

নিরীক্ষণের পদ্ধতিটি অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। অর্থাৎ পদ্ধতিটি এমন হতে হবে যে–

১. বিচারের সময় নিরীক্ষণের রেকর্ডটি পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বিচারকের কোনো অসুবিধা না হয়।

২. যে ব্যক্তি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থাকবে, রেকর্ডটি দেখার পর তারও যেন এটি বলার কোনো সুযোগ না থাকে যে, কাজটি সে করেনি বা কথাটি সে বলেনি।

নিরীক্ষিত বিষয়টি কোনো কিছুতে লিখে রেখে এবং সে লেখা উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে বা সাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, ঐ দুটো শর্ত শতভাগ পূরণ নাও হতে পারে। অর্থাৎ বিচারক সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা নাও পেতে পারে বা অপরাধী তথ্যটি সত্য নয় বলে দাবিও করতে পারে।

মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী নিরীক্ষণের যে পদ্ধতি, উপরোক্ত দুটো শর্ত শতভাগ পূরণ করতে পারবে তা হচ্ছে, ভিডিও নিরীক্ষণ পদ্ধতি। অর্থাৎ ঐ শর্ত পূরণ করে বিচার করতে হলে প্রতিটি মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও'র মাধ্যমে রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং বিচারের সময় সেই ভিডিও রেকর্ড পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তাহলে বিচারক যেমন শতভাগ নিশ্চয়তাসহকারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। তেমনি অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে কাজটি করেনি বলে টু শব্দটি করারও অবকাশ থাকবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

পৃথিবীর কোনো সরকারি সংস্থার পক্ষে সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার প্রকাশ্য ও গোপন সব কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে প্রাথমিক স্তরের (দুনিয়ার) বিচারের জন্যও সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানেও নিরীক্ষণকারীরা হবে মানুষ। কিন্তু কুরআনের আইনের চূড়ান্ত বিচারের জন্য সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। বিষয়টি কুরআনের আইনের প্রণেতা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ .

আর অবশ্যই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ। (তারা) সম্মানিত লেখকগণ (রের্কডকারী)। তারা জানে তোমরা কী করো।

(সুরা আল ইনফিতার/৮২ : ১০-১২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় আগের তাফসীরকারকরা লিখেছেন– মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ফেরেশতারা লিখে রাখবেন। ঐ 'লেখা আমলনামা' পরকালে মানুষকে পড়তে দেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

মানবসভ্যতার আগের জ্ঞান অনুযায়ী 'লেখা' শব্দটার একমাত্র অর্থ হতো কলমের সাহায্যে কোনো কিছুর ওপর হাত দিয়ে লেখা। তাই আগের তাফসীরকারকদের করা আয়াতসমূহের ঐ ব্যাখ্যা তখন সঠিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি– পিন (Pin), আলোক রশ্মি (Light ray), লেজার রশ্মি (Laser ray) বা শব্দের প্রকম্পনের (Sound wave) মাধ্যমে ভিডিও টেপ (Video tape), কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) ইত্যাদির ওপর দাগ (Impression) কাটাও (রেকর্ড করা) এক ধরনের লেখা।

তাই মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আয়াতগুলোর অর্থ হবে– 'সকল মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। সে সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কগণ মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও পদ্ধতিতে রেকর্ড করে রাখছেন।

কুরআনের নিম্নের তথ্য দুটি এ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ . اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমরা জানি। আর আমরা তার ঘাড়ের ধমনীর চেয়েও অধিক নিকটতর। যখন দুজন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা) ডানে এবং বামে বসে (তথ্য) সংগ্রহ করছে। সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা সংরক্ষণের জন্য) তার কাছে থাকে একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক।

(সুরা ক্বফ/৫০ : ১৬-১৮)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে–

- প্রথমে বলেছেন, মানুষের মনের কথা তিনি জানেন বা জানতে পারেন।
- তারপর বলেছেন, তিনি বা তার কর্মচারীরা সর্বক্ষণ মানুষের চারপাশে অতি নিকটবর্তী অবস্থানে আছেন।
- সবশেষে তিনি বলেছেন, দুজন ফেরেশতা মানুষের সাথে সর্বদা থাকেন এবং তারা মানুষের সকল কথা সংরক্ষণ করছেন।

লক্ষণীয় হচ্ছে– আল্লাহ এখানে ফেরেশতাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি কী হবে সেটি নির্দিষ্ট করে না বলে উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। সুতরাং মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়– সেই সংরক্ষণ পদ্ধতি হবে ভিডিও রেকর্ডিং।

কারণ, আল্লাহ নিশ্চয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কাজের রেকর্ড সংগ্রহ করবেন। আর কলম দিয়ে লেখা থেকে ভিডিও রেকর্ডিং যে অনেক অনেক উন্নত পদ্ধতি, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۔ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۔

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۔

সেদিন মানুষ সদরের দিকে আসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা আল যিলযাল/৯৯ : ৬-৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে কুরআনের আইনের প্রণেতা 'পড়া' বা 'শুনা' শব্দ ব্যবহার না করে 'দেখা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই ওপরে বর্ণিত সুরা ইনফিতারের ১০-১২ নং এবং সুরা ক্বফের ১৬-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে এ আয়াত তিনটির বক্তব্য সমন্বয় করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে বলেছেন– মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কাজ তাঁর গোয়েন্দা কর্মচারীরা ভিডিও পদ্ধতিতে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। চূড়ান্ত বিচারের দিন ঐ ভিডিও রেকর্ড বিচারের তথ্য-প্রমাণ হিসেবে সকলকে দেখানো হবে।

♣♣ তাই সহজে বলা যায়– মানুষের দুনিয়ার কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণের পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

৪. চালু থাকা বিষয়গুলোকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা

অনেক কাজ/বিষয় আছে যা চালু থাকে। যেমন– বই, মসজিদ, মাদ্রাসা, জুয়ার ঘর (Casino), সিনেমা হল ইত্যাদি। এ সকল বিষয়/কাজের জন্য কাউকে পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে যতদিন ঐ কাজ/বিষয়টা চলতে থাকবে, ততদিনের ফলাফলকে হিসাবে আনতে হবে। আর এ জন্য দরকার, ঐ ধরনের কাজ বা বিষয় ততদিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা যতদিন তা চলতে থাকবে। অর্থাৎ ঐ ধরনের সকল কাজকে নিরীক্ষণ করতে হবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত। এটি করতে হলে যে সত্তা নিরীক্ষণ করবে, তাকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময়ে এবং পরেও তাকে এবং তার নিরীক্ষণের রেকর্ড অক্ষত থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে যে সরকার এবং যে কর্মচারীরা নিরীক্ষণ করবে, তারা উভয়েই মরণশীল বা ক্ষণস্থায়ী। আর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে তার বা তাদের নিরীক্ষণ ধারণকারী বস্তুটিও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মানব রচিত আইনে এ শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে প্রাথমিক (দুনিয়ার) বিচারের জন্য যারা নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে তারা মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের জন্য নিরীক্ষণের দায়িত্বে যারা নিযুক্ত আছেন তারা ফেরেশতা। ফেরেশতারা পৃথিবী ধ্বংসের সময় (কিয়ামতের সময়) এবং ধ্বংস হওয়ার পরও বেঁচে থাকবে। ঐ নিরীক্ষকদের পক্ষে তাই চলতে থাকা কাজ বা বিষয়গুলোকে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা এবং তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

♣♣ তাই কুরআনের আইন, আইন যুক্তিসংগত হওয়ার এ শর্তটিও পূর্ণ করতে পারবে। কিন্তু মানব রচিত আইনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মানদণ্ড-৩.৫

বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা

আইন জানা ও মানার সাথে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা যদি কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে বেশি বা কম পেয়ে থাকে তবে আইন মানা বা না মানার ভিত্তিতে বিচার করে পুরষ্কার বা শাস্তি দেওয়ার সময় সেটি বিবেচনায় আনতে হবে। এটি না আনলে ঐ বিচার ন্যায়বিচার হবে না। কারণ, জন্মের স্থান ও কালের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে সাধারণত এটি বিবেচনায় আনা হয় না। যেমন– মানব রচিত আইনে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি অধিক বিলাসবহুল জীবনযাপন করার জন্য চুরি করলে যে শাস্তি, গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি পেটের দায়ে চুরি করলেও একই শাস্তি।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়া ও পরকাল, উভয় স্থানের বিচারেই এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। জন্মগতভাবে বেশি বা কম পাওয়া সকল বিষয় সেখানে বিবেচনায় আনা হবে।

জন্মগতভাবে বেশি বা কম পাওয়া বিষয়সমূহ যা হতে পারে–

১. সম্পদ বেশি বা কম পাওয়া।
২. মেধা শক্তি বেশি বা কম পাওয়া।
৩. আরবী ভাষা জানার সুযোগ বেশি বা কম পাওয়া।
৪. লেখা-পড়ার সুযোগ বেশি বা কম পাওয়া।
৫. স্মরণশক্তি বেশি বা কম পাওয়া।
৬. শরীরের গঠন ও গায়ের রং ভালো বা খারাপ হওয়া।
৭. ইত্যাদি।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়– কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে জন্মসূত্রে ধনী হওয়া ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কিন্তু গরীবের ঘরে জন্ম হওয়ার কারণে পেটের দায়ে চুরি করলে তার কোনো শাস্তি নেই।

তবে দুনিয়ার বিচারের তথ্যের দুর্বলতা এবং বিচারকের বিচক্ষণতার অভাবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবার ব্যাপারে শতভাগ সুবিচার করা সাধারণত সম্ভব হয় না। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে (পরকালীন বিচার) এ বিষয়টি নিখুঁতভাবে বিবেচনায় এনে সকলকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

এ কথাটিই কুরআনের আইনের প্রণেতা নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ط ....

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন। ... ...

(সুরা আল আনআম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জানিয়েছেন– জন্মগত কারণে কোনো ব্যক্তি ইসলাম জানা ও মানার ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পেয়ে থাকলে পরকালের বিচারে তা বিবেচনায় এনেই তিনি বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। এ সুযোগ-সুবিধা আগে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধার যেকোনোটি হতে পারে।

তথ্য-২.১

.....وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

... ... আর আমরা রসুল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

তথ্য-২.২

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۛ .

আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।

(সুরা আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

তথ্য-২.৩

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

এটি এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুমের কাজ করেন না।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তিনটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছিয়ে তিনি কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে শাস্তি দেবেন না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– জন্মস্থানের কারণে যে ব্যক্তি ইসলাম জানতে পারেনি এবং যে ব্যক্তি ইসলাম সহজে জানতে পেরেছে, উভয় ব্যক্তির ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার মানদণ্ড ভিন্ন হবে। প্রথম গ্রুপের মানদণ্ড দ্বিতীয় গ্রুপের মানদণ্ডের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

♣♣ তাই সহজে বলা যায়, এ মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-৩.৬

ওকালতি ও সাক্ষী ব্যবস্থার ধরন

ওকালতি ও সাক্ষী প্রথা বিচার ব্যবস্থার একটি অংশ। তাই ওকালতি ও সাক্ষী প্রথা উভয় আইনেই আছে। তবে তার ধরন ও ব্যাপ্তিতে পার্থক্য আছে। ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো– সঠিক বিচার করার জন্য তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বিচারককে সহায়তা করা।

এ মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের পর্যালোচনা–

দুনিয়ার বিচার

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের ওকালতি প্রথায় দেখা যায় একজন উকিল, অপরাধী জেনেও তার মক্কেলের যাতে মোটেই বা কম শাস্তি হয় সে ব্যাপারে বিচারককে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ধরনের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারক এভাবে বিভ্রান্ত হয়েও যায়। আবার সাক্ষীরাও নিজ স্বার্থে নানা ধরনের মিথ্যা সাক্ষী দিয়েও বিচারককে বিভ্রান্ত করে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে উকিল ও সাক্ষীদেরকে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকতে বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকতে এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াকে নানাভাবে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল কুরআনের দুটি বক্তব্য–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

আর তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকোনা এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৪২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে সকল মানুষকে, যার মধ্যে উকিল (Advocate) ও সাক্ষীরাও অন্তর্ভুক্ত, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী দিতে এবং জানা থাকা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান অথবা বিত্তহীন যাই হোক আল্লাহ দুজনেরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে চলো তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৩৫)

♣♣ কুরআনের আইনে, এক ব্যক্তি অপরাধ করেছে তা জানা বা বুঝা সত্ত্বেও ওকালতি বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বিচারককে বিভ্রান্ত করা একটি বড়ো অপরাধ। এ অপরাধ প্রমাণিত হলে উকিল বা সাক্ষীদের দুনিয়াতেই শাস্তি পেতে হবে। আর দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেলেও পরকালের শাস্তি থেকে তারা কোনোমতেই রেহাই পাবে না। এ জন্য দুনিয়ার বিচারে কুরআনের আইনের ওকালতি ও সাক্ষ্য ব্যবস্থা, বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে, মানব রচিত আইনের তুলনায় বেশি সহায়ক হবে।

পরকালীন বিচার

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে পরকালীন বিচার নেই। তাই এ আইনে পরকালীন বিচারের ওকালতি বা সাক্ষীর ব্যবস্থা থাকা বা না থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে পরকালীন বিচারে ওকালতি আছে। ঐ ওকালতির নাম হলো 'শাফায়াত'।

পরকালে শাফায়াতের যে নিয়ম-কানুন হবে তা হলো–

১. শাফায়াত করার যোগ্যতা

প্রথমে শাফায়াতকারীকে শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি নেওয়ার বিধান থেকেই বোঝা যায় যে, সবাই শাফায়াতের অনুমতি পাবে না। অনুমতি পাবে নবী-রসুলগণ ও অতি উচ্চমানের নেক্কার মু'মিনগণ, যারা সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. শাফায়াত পাওয়ার যোগ্যতা

শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা (বড়ো) গুনাহ মাফ হবে না। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো 'তাওবা'। আর সে তাওবা করতে হবে

মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে। অর্থাৎ মৃত্যু আসার এমন সময় আগে যখন ব্যক্তির গুনাহর কাজ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে গুনাহর কাজ করছে না। শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হবে শুধু ছগীরা ও মধ্যম (না ছগীরা ও না কবীরা) গুনাহ।

অর্থাৎ পরকালে যাদের আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাদের জন্য শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না। শাফায়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- **'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটিতে।

মানদণ্ড-৩.৭
দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন

আইন অমান্য করার জন্য শাস্তির বিধান সকল আইনে আছে। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো–

১. অন্য মানুষ যেন সন্দেহাতীতভাবে জানতে ও বুঝতে পারে যে, ঐ ধরনের অপরাধ করলে কী ধরনের শাস্তি হয়। আর এর ফলস্বরূপ আশা করা হয় সমাজের অন্য মানুষেরা ঐ ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে।
২. যে শাস্তি পেল সে যাতে আর ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

শাস্তি দেওয়ার এ দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। কারণ–

১. যে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেল সেতো পুনরায় ঐ অপরাধ করার সুযোগ পাবে না।
২. যে শাস্তি পেল সেতো একজন ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু ঐ অপরাধ করার মতো অসংখ্য ব্যক্তি সমাজে আছে। তাদেরকে ঐ অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারলে সমাজের অধিক কল্যাণ হবে।

দুনিয়ার বিচারে শাস্তি দেওয়ার অত্যন্ত যুক্তিসংগত ঐ দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হতে হলে, সে শাস্তিকে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. শাস্তি দেয়ার সময় অপরাধী নয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে : শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ণয় করার সময় অপরাধী ব্যক্তির প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখানোর চেয়ে

সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ অপরাধীর প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখাতে গেলে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ হয়ে যাবে এমন যা অন্যদের বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ করা থেকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ অপরাধীর প্রতি দয়া দেখানোর অর্থ হচ্ছে অনেক নিরপরাধ মানুষের শাস্তির ব্যবস্থা করা। এর ফলে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২. শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক : এটি না হলে ঐ শাস্তি দেখে মানুষ ভীত হবে না। তাই ঐ শাস্তি সমাজের অপরাধ প্রবণ মানুষকে অপরাধ করতে বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ আবার করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এর ফলেও শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

৩. শাস্তি হতে হবে জনসমক্ষে : শাস্তি জনসমক্ষে হলে হাজার হাজার বা কোটি কোটি মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে পায়। আর নিজ চোখে দেখলে শাস্তির ধরনটি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় এবং মনের ওপর ঐ শাস্তির যে প্রভাব পড়ে তার প্রচণ্ডতা, শাস্তির কথা পড়া বা শোনার মাধ্যমে জানার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হয়। তাই জনসমক্ষে দেওয়া শাস্তি, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ভূমিকা রাখে।

৪. সচরাচর ঘটা অপরাধের শাস্তি সদা দৃষ্টিগোচরমূলক হওয়া : সচরাচর ঘটা অপরাধের শাস্তি এমন হলে ভালো হয় যেন অপরাধী ব্যক্তিকে দেখলেই বুঝা যায় তাকে ঐ নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সকল সময় উন্মুক্ত থাকে অর্থাৎ সকল সময় দেখা যায় (দৃষ্টিগোচরমূলক), শরীরের এমন কোনো অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে শাস্তি দিলে তা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ওপরের Common sense সম্মত দৃষ্টিকোণের আলোকে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনের দুনিয়ার বিচারের পর্যালোচনা–

মানব রচিত আইন

শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি স্থির করার সময় মানব রচিত আইনে অপরাধীর সম্মান, মর্যাদা, কষ্ট, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ মানব রচিত আইনে–

১. অধিকাংশ শাস্তি লঘু হয় বা দৃষ্টান্তমূলক হয় না।

২. শাস্তি কার্যকর করা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারের মধ্যে।

৩. সকল সময় উন্মুক্ত থাকে এমন কোনো অঙ্গ স্থায়ীভাবে বিকৃত করে শাস্তি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

তাই মানব রচিত আইনের শাস্তি তার উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ অপরাধ ঘটার মাত্রা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। আর এর ফলে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় বা তাদের শান্তি, সম্মান, মর্যাদা ও মানবাধিকার বেশি লঙ্ঘিত হয়। এটা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর প্রণীত আইনে দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের সময় নিরপরাধ সাধারণ মানুষের কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অপরাধীর কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই সেখানে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি ওপরে উল্লিখিত সকল শর্ত সুনিপুণভাবে পূরণ করেছে।

আল কুরআনে বর্ণিত শাস্তির সেই ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতির কয়েকটি হচ্ছে–

১. **শাস্তি জনসমক্ষে দেওয়া :** কুরআনের আইনের প্রণেতা অপরাধের শাস্তি, মানুষের সামনে অর্থাৎ প্রকাশ্যে দিতে বলেছেন। এটা তিনি সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অবিবাহিত লোকদের জেনা করার জন্য শাস্তির প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে, এভাবে–

.....وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

... ... আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সুরা আন নূর/ ২৪ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে। যাতে হাজার হাজার, লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষ তা দেখতে পায়। কারণ, শাস্তি দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আর সে প্রতিবন্ধকতা সব থেকে বেশি গড়ে ওঠে নিজ চোখে শাস্তিটি দেখলে।

২. **শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হওয়া :** কুরআনের আইন প্রণেতা দৃষ্টান্তমূলকভাবে শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.....

আর আমরা তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে– প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের

বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। ... ...

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে বলেছেন, কুরআনের মতো তাওরাতেও তিনি (ইয়াহুদীদের জন্য) অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য লিখে দিয়েছিলেন যে– কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, কারো চোখ উঠিয়ে ফেলে, কারো কান কেটে দেয়, কারো দাঁত ভেঙে দেয় বা কাউকে যখম করে তবে সরকারিভাবে (ব্যক্তিগতভাবে নয়) বিচার করে তাকেও যথাক্রমে হত্যা করতে, চোখ উঠিয়ে ফেলতে, কান কেটে দিতে, দাঁত ভেঙে দিতে বা সমপরিমাণ যখম করে দিতে হবে।

৩. **শাস্তি দৃষ্টিগোচরমূলক হওয়া :** কুরআনের আইন প্রণেতা সচরাচর বা বেশি ঘটা অপরাধের শাস্তি দিতে বলেছেন, সহজে দেখা যায় এমন অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে চুরির শাস্তি হিসেবে পুরুষ ও মহিলা উভয় চোরেরই হাত কেটে দিতে বলেছেন। এই শাস্তির প্রয়োগের ব্যাপারে রসুল স. ও সাহাবায়ে কেরামদের কর্মনীতি পর্যালোচনা করলে চূড়ান্তভাবে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– শুধু ধনী চোরদের এ শাস্তি দিতে হবে। গরিব চোর যারা অভাবে পড়ে চুরি করে তাদের এ শাস্তি দেওয়া যাবে না। বরং অভাবে পড়ে কেন তাকে চুরি করতে হলো সে জন্য তাদের শাসককে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, শাস্তিটি একটি শিক্ষামূলক শাস্তি। অর্থাৎ শাস্তিটি তিনি চোর ও অন্য মানুষদের এ শিক্ষাটি প্রদানের জন্য দিয়েছেন যে– বিশেষ অভাব ছাড়া চুরি করলে তাকে নিশ্চিতভাবে এই শাস্তি পেতে হবে। আর একজন চোরের শাস্তি স্বচোক্ষে দেখার মাধ্যমে সকলে যাতে শিক্ষাটি পেতে পারে, সে জন্য সহজে দেখা যায় এমন একটি অঙ্গের স্থায়ী

বিকৃতি ঘটিয়ে শাস্তিটি দেওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। চোরটি যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন অসংখ্য মানুষ তাকে দেখে এ বাস্তব শিক্ষাটি পেতে থাকবে।

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে কুরআনের আইন দুনিয়ার বিচারে শাস্তির যে ধরন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ণয় করে দিয়েছে, তা শাস্তি দেওয়ার যুক্তিসম্মত ও কল্যাণকর সকল উদ্দেশ্য সুনিপুণভাবে পূরণ করতে পারে। কিন্তু মানব রচিত আইন তা পারে না।

মানদণ্ড-৩.৮
শাস্তি থেকে কারো রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা

আইন সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে হলে অপরাধ করলে কেউ শাস্তি থেকে রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তা না হলে অপরাধীরা অপরাধ করতে সাহস পাবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে যেহেতু বিচার হবে এক স্তরে এবং বিচারক ও তথ্য সংগ্রহকারীরা হবে মানুষ তাই সেখানে সকল অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা অসম্ভব।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের অংশে ঐ দুর্বলতা থাকলেও পরকালীন বিচারে কেউ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না এটি শতভাগ নিশ্চিত।

তবে বহুল প্রচারিত একটি কথা বড়ো অপরাধীর (কবীরা গুনাহগার) সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে দারুণভাবে অশান্তিময় করেছে। **কথাটি হলো–** কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন ব্যক্তিরা কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে। এ প্রচারণাটি কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের স্পষ্ট বিরোধী। কুরআন, অনেক শক্তিশালী সহীহ হাদীস ও আকলের স্পষ্ট বিপরীত কয়েকটি সহীহ হাদীস দিয়ে এ ধ্বংশযজ্ঞ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

♣♣ তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন অধিক যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৯

পুরস্কারের ধরন

আইন মানতে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা যুক্তিসংগত। আর সে পুরস্কারের মান এমন হওয়া উচিত যেন তার আশায় আইন মানতে গিয়ে কিছু কষ্ট হলেও মানুষ তা স্বীকার করে নিতে পারে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

আইন মানাকে উৎসাহিত করতে সকলের জন্য প্রযোজ্য কোনো ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট পুরস্কারের ব্যবস্থা মানব রচিত আইনে নেই। যা আছে সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বিরাটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের স্তরে মানব রচিত আইনের মতো এ বিষয়ে দুর্বলতা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত কম। তবে পরকালীন বিচারে তা পূরণ হয়ে যাবে। যারা দুনিয়ায় কুরআনের আইন মেনে চলবে তাদের সকলের জন্য পরকালের অনন্ত জীবনে অপরূপ পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। ঐ পুরস্কারের আশায় আইন মানার কারণে কষ্ট হলেও তা স্বীকার করে নেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। আর অসংখ্য মানুষ ঐ পুরস্কারের আশায় অকল্পনীয় কষ্ট মেনে নিয়েছে এমনকি জীবনও দিয়ে দিয়েছে তার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরিভূরি।

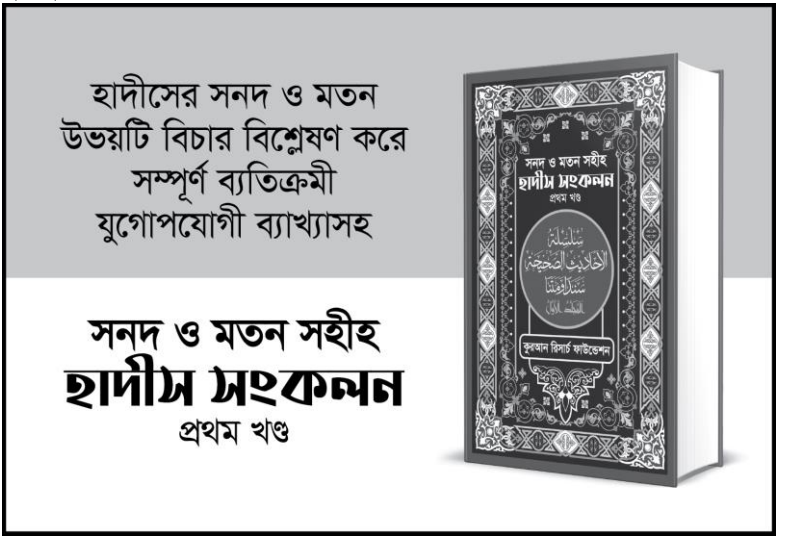

শেষ কথা

সুধী পাঠক, ওপরের তথ্যগুলো জানার পর আশা করি এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না যে– কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তার ধারে কাছেও নেই। আর কুরআনের আইন যে মানুষের সমাজকে অপূর্বভাবে কল্যাণময় বা শান্তিময় করতে পারে, তার বাস্তব কয়েকটি প্রমাণ হলো–

ক. রসুল স. ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

রসুল স.-এর মদিনা শরীফে হিজরাতের পর থেকে পৃথিবীতে কুরআনের আইনের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত পৃথিবী কুরআনের আইন পুরোপুরি চালু থাকার সুফল দেখেছে। ঐ সময় মানব সমাজ কী অপূর্ব শান্তিময় ছিল নিম্নের কয়েকটি তথ্যই তার উৎকৃষ্ট দলিল–

১. রাষ্ট্র প্রধানের (হযরত ওমর রা.) নিজে ঘুরে ঘুরে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা দেখা এবং একজনের ঘরে গম নেই দেখে রাষ্ট্রীয় খাদ্য গুদাম থেকে নিজ পিঠে করে গম বয়ে নিয়ে নাগরিকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া।

২. সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানকে (খলিফা) জনসমক্ষে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা– 'সরকারের দেওয়া কাপড় তাদের (নাগরিকদের) তুলনায় অধিক তিনি কীভাবে পেলেন?' আর রাষ্ট্রপ্রধানের (হযরত ওমর রা.) অসন্তুষ্ট না হয়ে সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া।

৩. তৎকালীন গরিব আরব দেশ, কুরআনের আইন চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে এতটা ধনী হয়ে যায় যে, যাকাত নেওয়ার মতো গরিব লোক সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৪. যুদ্ধের ময়দানে আহত ও পিপাসার্ত সৈনিকের পানি হাতে পাওয়ার পর নিজে পান না করে অপর আহত সৈনিকদের আগে পান করাতে বলা এবং নিজে পিপাসায় মৃত্যু বরণ করা।

৫. তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ ও অসভ্য দেশে কয়েক বছরের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসা।

খ. বর্তমান বিশ্বের উদাহরণ

বর্তমান বিশ্বে সৌদি আরবে কুরআনের আইনের মাত্র কয়েকটি অপরাধের (চুরি, হত্যা ইত্যাদি) শাস্তি (প্রকাশ্যে হাত ও গলা কাটা ইত্যাদি) চালু আছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়– বর্তমান বিশ্বের সকল তথাকথিত উন্নত দেশের তুলনায় সৌদি আরবে অপরাধের সংখ্যা অনেক অনেক কম।

তাই এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়– মানুষ যদি অন্তত দুনিয়ায়ও প্রকৃত শান্তি পেতে চায়, তবে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাদের কুরআনের আইনের ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। আর পৃথিবীর সকল বিবেকবান (Common sense-ধারী) মানুষ, যারা চায় মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদেরকে কালবিলম্ব না করে কুরআনের আইনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আর যারা শুধু নিজে শান্তিতে থাকতে চায়, তাদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ, সমাজে শান্তি না থাকলে সে একা কোনোভাবেই শান্তিতে থাকতে পারবে না।

সবশেষে সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

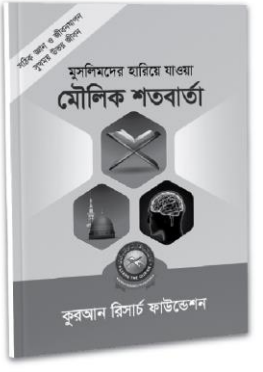

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক আরবী গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

- দুই খণ্ড
- শুধু বাংলা
- পকেট সাইজ